বিনিদ্র

দিব্যেন্দু পালিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ৯

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনিদ্র

জুনের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে হঠাৎই একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ল দীপ্ত।

কারণ তেমন কোনো ছিল না। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের সেল্‌স ম্যানেজার সিন্‌হাকে ডিনারে ডেকেছিল কাল, পার্টি ভাঙতে দেরী হলো, হ্যাঙ্গোভার কাটিয়ে ভোরে উঠতেও। ঘটনা হিসেবে এর কোথাও নতুনত্ব নেই। এরপর শুরু হবে আর-একটি দিন—মেক্‌ ইওরসেল্‌ফ্‌ রেডী অ্যাজ ফাস্‌ট্‌ অ্যাজ পসিব্‌ল, ম্যুভ্‌ ইওরসেল্‌ফ অ্যাজ ক্যুইক্‌লি অ্যাজ পসিব্‌ল। ঠিক। লাইফ ইজ লাইক দ্যাট। তাতে অলস বোধ করে না দীপ্ত। নড়াচড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে স্বাস্থ্য—পুরস্কারের জন্যে ভবিষ্যৎ। সে দমবে কেন!

তফাৎ ছিল আজকের সকালটায়। আলিপুরের আকাশ বহু দূর পর্যন্ত ছেয়ে গেছে মেঘে; একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় রোদ চাপা দিয়ে ক্রমশ দখল কেড়ে নিচ্ছে মেঘ, বৃষ্টি দেবে। রোদ, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহুকাল হলো, আছে শুধু এ-সবের স্মৃতি—পুরনো অনুষঙ্গ থেকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না কোন মেঘ বৃষ্টি দেয়। কাল রাতে ডীনারের সাফল্য ও আজ সকালের আকাশ অসময়ের আলস্য ডেকে আনল শরীরে। মধুর আলস্য। তাই তোলার অভ্যাস তার নেই। এককালে তুলতো; সে অনেকদিন আগেকার কথা—দীপ্ত তখন দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। শরীরে ভিটামিন সি'র অভাব দূর করতে এখন প্রত্যহ সকালে পুরো এক গ্লাস কমলার রসপান করে সে।

এখন আটটা। এইমাত্র ড্রাইভারের সঙ্গে স্কুলে বেরিয়ে গেছে পাপু। জয়িতাও আড়ালে, সম্ভবত ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে ব্যস্ত। আর সবই চুপ। সচরাচর পাওয়া যায় না, তবে, দীপ্ত ভাবল, অফিসে বেরুবার আগে এখন কিছুটা সময় সে কাটাতে পারে নিজের জন্যে, বিছানার আরামে, একান্ত ক'রে।

তবু অস্বস্তি লাগল একটু। কী ভেবে প্লেয়ারে এলভিস্ চাপিয়ে আবার বিছানায় ফিরে এলো দীপ্ত ; ইংরিজী দৈনিকটা টেনে নিয় টান-টান হয়ে শুলো। দুরন্ত বাজনা, স্তব্ধতার জ্যা-মুক্ত হয়ে আছড়ে পড়ছে ঘরের দেয়ালে। এখুনি হয়তো ছুটে আসবে জয়িতা, জানতে চাইবে এই হঠাৎ-খুশীর কারণ। জয়িতাকে কি বলবে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্সের বিজনেস এখন তার হাতের মুঠোয় ! নাকি সে একটু দ্রুত ভাবছে ! নিজেকে ঠিকমতো গুছিয়ে উঠতে না পেরে দীপ্ত চ'লে গেল 'পার্সোনাল' কলামে—গতকাল ও পরশুর মধ্যে এই স্পেস্ প্রব্লেমের দিনেও অন্তত সাতটি ধনী শিশুর জন্ম হয়েছে এই কলকাতায়, একটি মেয়ে ইতিমধ্যেই নাম পেয়ে গেছে –রূপা। বেশ তৎপর বলতে হবে এদের। পাপুব জন্যে তো এখনো একটা যুৎসই মডার্ন নাম খুজে পায়নি তারা। জয়িতা অবশ্য বলেছিল 'প্রদীপ্ত' ; বড্ড কমন হয়ে যায় ভেবে ঠাট্টা করেছিল দীপ্ত, 'ও কোনোদিনই প্রো-দীপ্ত হবে না, নক্সাল-টক্সাল হয়ে যেতে পারে। বরং অন্য নাম ভাবো—'

দরজায় কি কলিং বেলের শব্দ ? সম্ভবত। দীপ্ত উৎকর্ণ হলো, কাগজটা সরিয়ে রাখল পাশে, উঠল না। নিশ্চিত অপটু হাত ; না হ'লে এভাবে থেমে থেমে, কয়েক সেকেণ্ড ধ'রে বাজতো না। ঘরের বাজনায় ঘষা খেয়ে শব্দটা দূর রাস্তায় ব্রেক-কষার শব্দের মতো অস্পষ্ট হতে হতে থেমে গেল। আলিপুরের এই নতুন ফ্ল্যাটে আসবার পর থেকে লোকজনের যাতায়াত কমে গেছে অনেক, বিশেষত সাধারণ দিনে আর সকালে। তবে ? কে এলো !

ইতিমধ্যে দরজা খুলেছে ও বন্ধ হয়েছে। জয়িতার গলা,

'কৌন আসলাম?' জবাবটা এগিয়ে এলো ঘরের দরজা পর্যন্ত। হাল্‌কা পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে আসলাম বলল, 'এক বাবু আয়া হ্যায়, সাব্‌।'

'বাবু?' দীপ্ত উঠে বসল, 'কৌন সা বাবু?'

'কেয়া বোলা, ভাই লাগতা হ্যায়!'

'ভাই!' দীপ্ত ভাবল একটু; এ-রকম মুহূর্তে অন্যমনস্কতাই তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বলতে চাইছিল, এখন দেখা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আসলামের সামনে সে-কথা বলা উচিত হবে না।

'ঠিক হ্যায়, বৈঠনে বোলো—'

তীব্র গানের সুর পাশ কাটিয়ে গেল। আল্‌গা হাতে প্লেয়ার থামিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দীপ্ত। সকালে উঠে মুখ ধোওয়া আর দাড়ি কামানো তুটোই সে একসঙ্গে সারে। এই মুহূর্তে পোষাক ছাড়া শরীরের আর কোথাও রাতের আবহ নেই। এ-সব ছাড়বে একেবারে বাথরুমে ঢুকে। প্রাত্যহিকতার কথা ধরলে এখনই তার তৈরি হওয়ার সময়। ইতিমধ্যে যিনি এলেন তিনি আমার ভাই; রাবিশ! অলিপ্ত আজ পাঁচ বছর লণ্ডনে, প্র্যাকটিস করছে, সম্ভবত ওখানেই সেটেল করবে। ভাই বলতে সে। কিন্তু, আসলাম ভুল না শুনে থাকলে, আছে আরো কেউ কেউ—ভেবে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল দীপ্তর, চুলে ব্রাশ বুলোতে বুলোতে জিবটা ঠেলে দিল গালের দিকে। অবশ্যই সুপুরুষ সে—আয়না সাক্ষ্য দিচ্ছে; রূঢ়তা তার সহজতম অভিব্যক্তি।

বিলেতে ম্যানেজমেণ্ট পড়ার সময় বিহেভিয়ারিয়াল সায়ান্স ছিল তার অন্যতম বিষয়। প্রায় তখন থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে শিখেছে দীপ্ত। এখন, ড্রইংরুমে ঢুকেই, বুঝতে পারল, আগন্তুকের চরিত্রে আর যাই থাক, নেই আত্মবিশ্বাস। না হ'লে চমৎকারভাবে সাজানো ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে এসে বসতো সে, ঠিক পাখার নীচে। পরিবর্তে লোকটি বেছে নিয়েছে দরজার কাছাকাছি একটি আসন, একেবারে প্রান্তে, যেখানে পাখার

হাওয়া পৌঁছয় না—যেখান থেকে এক পা এগোলেই চ'লে যাওয়া যায় দরজার বাইরে। বিশুদ্ধ বাঙালী! পুরোপুরি না তাকিয়েই নিজের মনে অল্প হেসে নিল দীপ্ত। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! এবং তেমন ভালো ক'রে না দেখেও বুঝতে পারল, যুবকটিকে আগেও সে দেখেছে কোথাও, চেনা-চেনা লাগছে। কোথায়?

ইতিমধ্যে যুবকটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'এক পা এগিয়ে আসার ধরনে মনে হয় কীভাবে সূচনা করা যায় সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি। দীপ্তর আচরণে আপ্যায়ন নেই, সুতরাং, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। এ-সবই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। দূরবর্তী সোফায় ব'সে ততোক্ষণে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করেছে দীপ্ত, লাইটার জ্বালল। দেখাদেখি সেও বসল।

'ইয়েস?'

'দীপ্তদা, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি রতন।'

দাদা সম্বোধনে দীপ্ত বিশেষ অভ্যস্ত নয়, তেমন পছন্দও করে না। মিস্টার রে, বা দীপ্ত—সম্পর্ক অনুযায়ী এ দুটোর যে-কোনো একটিতে রুচি সাড়া দেয়। দাদা শুনলেই মনে হয় শোবার ঘরের পর্দা তুলে দাঁড়িয়েছে! প্রথম বাক্যটিতেই তাই সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারল, এখন হুট্ ক'রে কিছু করা যাবে না। রতন নামটি তার চেনা, মুখটিও, মনে হচ্ছে এই সেদিনও চিনত; যদিও পরিচয়ের উপলক্ষটা ঠিক ধরতে পারছে না।

রাশ আল্‌গা না করেই সিগারেটটা ঠোঁটে চাপল দীপ্ত।

'রতন মীন্‌স্?'

ছেলেটি হতাশ হলো। গায়ে ট্রাউজার্স আর শার্ট, পায়ে চটি, ছিপছিপে স্বাস্থ্য, মুখ জুড়ে বিশ্রী তেলা ভাব। কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে যে-কোনো বয়স হতে পারে। দাড়ি কামায়নি বা গজায়নি এখনো; গাল ও চিবুকের দিকে তাকিয়ে ঠিক বোঝা যায় না। তবে নার্ভাস, রিঅ্যাক্ট করে তাড়াতাড়ি।

'সুজনদাদের বাড়িতে দেখা হয়েছিল! শম্পাদি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন?'

ছুটো নামের উল্লেখেই ওলট-পালট হয়ে গেল। এরপর না-চেনার মানে হয় না। হারিয়ে ফেলা সূত্রটা টেনে নিয়ে নড়েচড়ে বসল দীপ্ত।

'মনে পড়েছে। তবে, সে তো অনেক বছর আগেকার কথা! তুমিই না হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্ট্যাণ্ড করেছিলে?'

'ফিফ্‌থ্‌ হয়েছিলাম।' রতন আশ্বস্ত হলো একটু, 'একটা দরকারে এসেছিলাম আপনার কাছে—'

আবার আড়ষ্ট বোধ করল দীপ্ত। কথাটা না বললেও চলত: এই চেহারা আর পোষাকে আজকাল যারা তার কাছে আসে, তারা দরকারেই আসে। দরকারের ধরনটাও অনুমান ক'রে নিতে পারে দীপ্ত। তবু আগ্রহ দেখাল।

'বলো, কী করতে পারি আমি?'

'মানে…', রতন ঘামছে। কপালে আঙুল ঘষে বলল, 'আপনার অফিসে ট্রেনী নিচ্ছেন, বিজ্ঞাপন দেখলাম কাগজে। আমি যদি সুযোগ পাই…'

'আই সী!'

পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে হাতে নিল রতন। না দেখেই বোঝা যায় চাকরির দরখাস্ত। দীপ্ত হাত বাড়াল না; আর-একটা সিগারেট ধরাবে ভেবেও নিরস্ত হলো। দেরী হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিসে পৌছুতে হবে তাকে, মীটিং আছে; একটা ফোনও আশা করছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌স্‌ থেকে। সিন্‌হার কাছ থেকে মোটামুটি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও চূড়ান্ত কিছু না-হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না। সিন্‌হার পরেও আছে মুখার্জী এবং টপ লেভেল, এ-বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তই সব। সুবিধে হলো সিন্‌হাও আপ-অ্যাণ্ড-কামিং, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই রিপ্লেস করবে মুখার্জিকে। ইতিমধ্যে অনেকটা সময় নষ্ট করল রতন। ক্লেভার চ্যাপ! ভাই ব'লে পরিচয় না দিলে সে হয়তো দেখাই করত না, তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ছুটি নতুন নাম—সুজন আর শম্পাদি। দীপ্ত অকৃতজ্ঞ নয়। এক

হিসেবে ওই দুটি নামের চুম্বকই প্রোথিত ক'রে রাখল তাকে।

'তুমি এখন কী করো ?'

'বিশেষ কিছুই নয়। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল, বি-এ পাশ করার আগেই বাবা মারা গেলেন।' একটু থামল রতন, সোজাসুজি তাকাল দীপ্তর মুখের দিকে। 'একটা স্কুলে পড়াচ্ছি আপাতত, লীভ ভেকান্সি। টিউসনও করি। বাড়িতে খাবার লোক পাঁচজন। বড়োই অসুবিধেয় আছি। শম্পাদি আপনার কথা বললেন। আপনি যদি একটু ছাখেন, দীপ্তদা—'

ডিসগাস্টিং! দীপ্ত উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি পড়াশুনোয় ভালো, কিন্তু বেসিকালি ডাল ; এই বয়সেই ভুগছে হীনম্মন্যতায়। নিতান্তই শম্পাদির সুপারিশ নিয়ে এসেছে, নয়তো যেখানে ও 'দীপ্তদা' ব'লে মেরুদণ্ড নোয়াল, আর কেউ-কেউ সেখানে 'স্যার' বলত। এরা ভাবে চাকরি প্রার্থনায় মেলে! এ-সব নতুন দেখছে না দীপ্ত, জানে কাজ হবে না এদের দিয়ে। চাকরি চাইতে চাইতেই ফুরিয়ে যাবে সব উদ্যম ; তারপর, যদি পেয়ে যায় চাকরি, শুরু হবে নিশ্চিন্তে হাই তোলার জীবন! মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে চরিত্র নেই, ধরনে আক্রমণ নেই কোনো।

কিন্তু, ছেলেটি কি বুঝবে না, সময়ের দাম আছে দীপ্তর— একজন চাকুরিপ্রার্থীর প্যানপ্যানানি শোনার জন্যে গোটা সকালটা সে নষ্ট করতে পারে না। রীতিমতো চাপ পড়তে শুরু হয়েছে শিরায়। নিঃশব্দে ঘরেব মধ্যে একবার পায়চারি ক'রে এসে দীপ্ত বলল, 'ঠিক আছে। এখনও কিছুই ফাইনালাইজ হয়নি, সময় লাগবে। দেখি কী করতে পারি।'

এতোক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রতন।

'আপনারা যা যা চেয়েছেন, আমার সবই আছে। এই অ্যাপ্লিকেসানটা কি দিয়ে যাবো ?'

'পাঠিয়ে দিলেই ভালো হতো।' সংযত গলায় বলল দীপ্ত, 'ঠিক আছে, দিয়ে যাও। আজ আমি ব্যস্ত আছি একটু—'

দরজার প্যাঁচটা নিজের হাতেই খুলে ধরল দীপ্ত। এর চেয়ে

বেশী স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করা যায় না নিজেকে।

রতনও সম্ভবত আঁচ করতে পাবল। বেরিয়ে যেতে-যেতে বল্ল, 'আপনার অসুবিধে করলাম বোধহয়—'

'নট অ্যাট অল—'

বিরক্তিটা প্রকাশ পেল দরজা বন্ধ করার শব্দে। অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'বল্স্…'। হাতের মুঠোয় খুব স্বাভাবিকভাবে কুঁকড়ে এলো খামটা।

বেডরুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়িতা। অন্যমনস্ক। দীপ্ত পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খুব নরম আলোয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে সদ্য ভোরবেলাব মতো ; জনবিরল, প্রায় শব্দহীন। একটু আগে, দীপ্তব হাঁটাচলার মাঝখানে, ছুটে গেছে একটা গাড়ি, শব্দের রেশ বলতে এইটুকুই। অল্প হাওয়ায় অনিচ্ছুকভাবে দুলছে গাছের পাতাগুলো। অবশ্য একেবারে জনশূন্য বলা ভুল। দীপ্ত লক্ষ করল, রাস্তার একধার দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবক, হাটার ধরনে স্টাইল নেই কোনো—ভিড়েব রাস্তা হ'লে অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে যেত।

কিন্তু, সে বিশ্বাস করে স্টাইলে, অ্যাগ্রেসনে। ভেতোমি সহ্য করতে পারে না, আদ্যন্ত বাঙালীপনাও। বলতে গেলে তার নিজেরও প্রধান সম্পদ ওই দুটি—যা নিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছে তার চরিত্র, চরিত্র থেকে ক্রমশ মিশে গেছে রক্তে। যখন সে কিছুই করত না, জীবন ছিল অনিশ্চিত, চলায় বলায় তখনও অভ্যাস ক'রে গেছে স্টাইল। তা না হ'লে মফঃস্বল শহরের এক হোমিওপ্যাথের ছেলে মাসিক সাড়ে তিন হাজার নিয়ে আলিপুরের এই বিশাল ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে পারত কি! মনে তো হয় না। এ-জন্যে পরিশ্রমও কম করতে হয়নি তাকে। মনে আছে, ঠিক উচ্চাবণে ইংবিজী বলা শেখাব জন্যে একদা সে পাঠ নিত এক ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে ; চুল ছাঁটত সাহেব পাড়ায়, সচেতন হয়েছিল ট্রাউজার্সের লেটেস্ট কাট নিয়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চেয়ে বেশী অভ্যস্ত হতে

শিখেছিল জ্যাজে। পৃথিবী তখনো বহুদূরে, তবু। 'তোর জন্যে মায়া হয়, দীপ্ত', একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল শম্পাদি, 'সাহেবরা দেশ ছেড়ে চ'লে যাবার পর সাহেব হতে শুরু করলি!'

কথার কথা, খোঁচা দেওয়ার সম্পর্ক শম্পাদির ছিল না। হোস্টেলে রুমমেট ছিল সুজন, সপ্তাহে দু'দিন দেখা করতে আসত শম্পাদি। কিন্তু ভাইয়েব থেকে কখনো আলাদা ক'রে ছাখেনি তাকে। সারাক্ষণ পলিটিক্স নিয়ে মেতে থাকত সুজন, কোনোদিন পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে ওঠেনি। 'ল অফ ডিমিনিশিং ইউটিলিটির একটা এক্‌সেপ্‌সান্‌ দীপ্ত—', বলেছিল, 'বুঝলি দিদি, কনট্রাস্ট। কী ভাগ্যিস দীপ্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে না! না হ'লে আমি দাঁড়াতে পারতুম না ওর পাশে!' এ-কথাতেও খোঁচা থাকতে পারে না। চেহারা ও ভঙ্গিতে তখনই প্রাণবান পৌরুষের অধিকারী দীপ্ত। তবু বিঁধেছিল বুকে। জবাব দিতে পারেনি। আত্মীয়া সম্পর্কের বাইরে শম্পাদিই তার জীবনের প্রথম নারী; সুন্দরী না হলেও স্বাস্থ্য ও স্বভাবে ব্যক্তিত্বময়ী, তার সান্নিধ্যে সর্বদাই দুর্বলতা অনুভব করত। সেদিন কথাগুলো হজম করলেও আজ মনে হয় নিজেকে শুধরেছে শম্পাদি। রতন এসেছিল তারই সুপারিশ নিয়ে। শম্পাদি কি আর জানে না এককালের অভ্যাস কতোদূর সার্থকতায় নিয়ে গেছে দীপ্তকে! ইয়েস, আই অ্যাম অ্যান এক্‌সেপ্‌সান্‌!

ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকালে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। হানা দেয় স্মৃতি। এমনও হতে পারে, আজকের উপলক্ষই তাকে ধাবিত করছিল স্মৃতির প্রতি। হুঁস হলো জয়িতার প্রশ্নে।

'হু ওয়াজ ছাট চ্যাপ?'

'চাকরি চায়।' দীপ্ত বলল, খামটা তখনো হাতের মুঠোয় ধরা, 'ওয়াণ্টস্‌ টু বী এ ট্রেনী···'

'ডু ইউ নো হিম? বাড়িতে এলো!'

'ওয়েল, ইন এ ওয়ে আই নো হিম। শম্পাদি পাঠিয়েছিল···'

'তাই বলো!' এখনো নাইটি ছাড়েনি জয়িতা। ঘাড় পর্যন্ত নামা চুলে চিরুনি জড়ানো। বাঁকিয়ে বলল, 'ইওর ওল্ড্ ফ্লেম্! সেইজন্যেই সকালে এতোটা সময় দিলে!'

'ডোন্ট বী সিলি!'

বাতাস এখন খুব সরল। মেঘে মনোরম হয়ে উঠেছে দিনের আলো। ঘাড়ের পিছন থেকে জয়িতার বুকের অনেকটাই দেখা যায়—মধু ও অলিভের সুসম ব্যবহারে চমৎকার হয়ে আছে সবকিছু। দীপ্ত প্রলোভিত হলো। চকিতে হাত বাড়িয়ে মুঠোর মধ্যে টেনে নিল স্ত্রীকে। যেন একটা ফণা তোলা সাপের মাথা আটকে পড়েছে মুঠোয়। ছটফট ক'রে উঠল জয়িতা।

'উফ্! ইউ হ্যাভ হার্ট মী!'

দীপ্ত জানে এখন কী করতে হবে। জয়িতাও। শারীরিক সম্পর্কে দীপ্তর দুর্বলতা নতুন নয়। দীপ্তর ইচ্ছেমতো বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে, দীপ্তকে মুখ বাড়ানোর সুযোগ দিল—ঠিক ততোক্ষণই, যতোক্ষণ না হ'লে এই মুহূর্তটির অপচয় হতো।

'বাস্ করো বাবা! দেরী হয়ে যাচ্ছে—', নিজেকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নিতে জয়িতা বলল, 'আজ তোমার দেরী হবে...'

'ঠিক পাঁচ মিনিট...'

পাখার হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রতনের দেওয়া খামটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল জয়িতা।

'আমিও বেরুবো একটু। চুলটা ঠিক করতে হবে। প্লীজ ড্রপ মী অন ইওর ওয়ে...'

'ও, কে...ও, কে...'

ততোক্ষণে খাম থেকে অ্যাপ্লিকেসানটা বের ক'রে চোখ বুলোতে শুরু করেছে জয়িতা। বাথরুমে যাবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিচ্ছে দীপ্ত। এও তার পুরনো অভ্যাস, সহজে দূরে যেতে পারে না।

'এ গুড্ ক্যাণ্ডিডেট।' জয়িতা বলল, 'আগাগোড়া স্কলারশিপ পেয়েছে!'

'বাট হি ডাজ্ নট স্ট্যাণ্ড এ চান্স্।'

'কেন!'

'তুমি ছাখোনি। অমন তেল্লা মুখ দিয়ে চলে না।'

'তাতে কি হয়েছে?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়িতার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল দীপ্ত।

'জয়ি, আমি বাড়ির কাজ করার লোক খুঁজছি না। খুঁজছি দশ বছর পরে আমার রিপ্লেসমেন্ট্। হোয়াট ডু ইউ থিংক্, শুধু স্কলারশিপহোল্ডার হলেই পাববে!'

জয়িতা একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হলো। সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পারবে না, তা তুমি এখনই জানছ কি ক'রে!'

এ-সব প্রসঙ্গের জন্যেও ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি অভ্যাস ক'রে রেখেছে দীপ্ত; এখনো তাই প্রয়োগ করল।

'ভাত টিপলেই বোঝা যায়...'

'তোমার অহঙ্কার বড়ো বেশী! অ্যাজ ইফ ইউ আর এ সাইকোলজিস্ট! এমনভাবে দরজাটা বন্ধ করলে...'

জয়িতা দাঁড়াল না। শেষের বাক্যটি এমনভাবে ছুঁড়ে গেল, যেন এতোক্ষণের অন্য সব কথাই ছিল উপলক্ষ, আসলে সে সরাসরি কথাটা উত্থাপন করতে পারেনি।

তবে কি দরজার শব্দই জয়িতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ব্যালকনিতে! হতে পারে, বাথরুমে ঢুকে ভাবল দীপ্ত; এমনও হতে পারে, ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষাই করত জয়িতা—তর্কে হেরে একটা অজুহাত বেছে নিল। কিন্তু, জয়িতা কি জানে, অহঙ্কার আছে বলেই দীপ্ত আজ দীপ্ত হতে পেরেছে!

জয়িতার স্বভাবের এই আকস্মিক মেয়েলিপনা খুশীই করল দীপ্তকে। জানে, একটু পরেই গাড়িতে উঠে সে অন্যরকম হয়ে যাবে, এর আগেও যেমন হয়েছে বহুবার। কালই তো! সিন্হার সঙ্গে প্রথম দফা নেচে এসেই বেঁকে বসেছিল। দীপ্তকে একা

পেয়ে বলল, 'কফি না বেচে লোকটার টুথ্‌পেস্ট্‌ বেচা উচিত!' এর চেয়ে অবাক-করা কথা দীপ্ত শোনেনি আগে। 'কেন!' বলতেই কাঁধ দুটো কান পর্যন্ত তুলে বিরক্তিতে হাত দুটো ডানার মতো দু'দিকে ছড়িয়ে জয়িতা বলল, 'বাব্বা, দুর্গন্ধ মুখে! মদের গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে!'

দাঁত-না-মাজার জন্যে নয়, দীপ্তর সন্দেহ জয়িতা ক্ষুব্ধ অন্য কোনো কারণে। হয়তো একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছে সিন্‌হা। কিন্তু, সেই মুহূর্তে জয়িতার অস্বস্তির চেয়েও বড়ো ব্যাপার ছিল। হাসিতে গাম্ভীর্য মিশিয়ে বলল, 'দাঁত না মাজুক, দশ লাখ টাকার বিজনেস দিতে পারে। জয়ি, ইউ মাস্ট হেল্‌প্‌ মী!'

জয়িতা বলল, 'আই অ্যাম টায়ার্ড অফ দিজ পিপ্‌ল্‌!'

মনের সায় থাকুক না-থাকুক, নিজেকে মানিয়ে নিতে জয়িতার জুড়ি নেই। আবার নিজের ভূমিকায় ফিরে যেতে মুখে হাল্‌কা পাফ্‌ বুলনো ছাড়া আর-কিছু দরকার হয়নি জয়িতার। দীপ্ত কি অস্বীকার করতে পারবে গত সাত বছরে তার একটানা জয়ের ইতিহাসে জয়িতার কোনো ভূমিকা নেই বা ছিল না! একদিন জয়িতাই কি বলেনি, অহঙ্কারবোধ না থাকলে কেউ কেরিয়ার তৈরি করতে পারে না! তাহ'লে আজকের অহঙ্কার তাকে এতো ক্ষুব্ধ করল কেন!

নাকি একটু ভুল করছে দীপ্ত, অহঙ্কার ভেবে সে যেটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, তাতে মিশে যাচ্ছে নীতিহীন অন্যকিছু—যা এমনকি জয়িতাকেও বিরূপ ক'রে তুলছে! দরজাটা সে বন্ধ করতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি, বাজেভাবে অনেকটা সময় নষ্ট হওয়ার জন্যে কিছুটা বিরক্তও ছিল সে-সময়, কিন্তু সেই মুহূর্তে শব্দ হওয়া না-হওয়ার ওপর সত্যিই কি কোনো হাত ছিল তার!

বাথরুমের নির্জনে, এই সকালে, হঠাৎই ধাঁধার সৃষ্টি হলো দীপ্তর মনে। অন্যমনস্কতার ভিতর এর থেকে বেরুবার একটা উপায় খুঁজল সে, পেল না। মাঝে মাঝে হয় এমনি, তুচ্ছ একটি ঘটনার জেরে ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা- -মনে হয় টান পড়ছে আত্মবিশ্বাসে!

এই মুহূর্তে যেমন হলো। বিভ্রান্ত দীপ্ত শাওয়ারের ট্যাপটা ঘুরিয়ে দিল আস্তে, দেখল, উচ্ছলতা থেকে প্রবল বৃষ্টিধারা আস্তে আস্তে কেমন লুকিয়ে নিচ্ছে বিন্দুগুলি। শেষে, যখন আর একটিও বিন্দু থাকল না, কোনোরকমে গায়ে তোয়ালে ঘষে নিঃশব্দে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো সে।
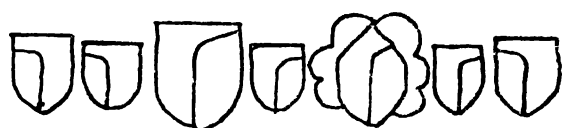
বৃষ্টির আভাস দিয়ে থিতিয়ে থাকল মেঘ, বৃষ্টি হলো না। গুমোট বেড়ে চলল শুধু। ঠাণ্ডা ঘরে বসেও অসহ ভাবটা টের পাচ্ছিল দীপ্ত; উঠে গিয়ে অ্যাডজাস্ট ক'রে এলো এয়ার-কণ্ডিসানারের স্যুইচ —স্বস্তি হলো না। বাইরের প্রত্যক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সম্ভবত এর সম্পর্ক নেই কোনো, হঠাৎই মনে হলো তার, অনুভূতিটা উঠছে ভিতর থেকে। কাচের জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে আড়ষ্ট আকাশ, আটতলা থেকে দেখা বলেই ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো উঁচু মাথার বাড়িগুলো ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট হয় না। মেঘে প্রকৃতিস্থ এই আকাশের কোথাও আছে সীমাহীন রুক্ষতা—সমুদ্রে ডুবে-থাকা কঠিন পাহাড়ের ক্বচিৎ জেগে-ওঠা মাথার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যেমন হয়, কাঠিন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে চোখ, এখনো সেইরকম হচ্ছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে মৃত একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিল জয়িতা—ঘটনাটা ঘটার কয়েকদিন আগে থেকেই শরীর কঠিন হয়ে যাওয়ার অনুযোগ করত, এই মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘটনাটা মনে পড়ে গেল দীপ্তর।

অনুভূতিটা সুখের নয়। ভাবনাগুলোকে একাগ্র করার চেষ্টা সত্ত্বেও গলে যাচ্ছে ফাঁক-ফোকর দিয়ে—নিয়ন্ত্রিত তাপের ভিতরেও যেমন ঢুকে পড়ে অসহিষ্ণু উত্তাপ। এই নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে সে তৃতীয় সিগারেটটি ধরাবার চেষ্টা করল—একটি মাত্র আশায়, যদি ফিরে পায় নিজেকে।

অথচ, তার কাজ ছিল; একটা নয়, অনেকগুলো। হিসেবমতো রাতে ঘণ্টা ছ-সাতের ঘুমে নিমগ্ন সময় ছাড়া বাকী সব সময়টুকুই তার কেটে যায় কাজে, কিংবা কাজের উদ্দেশ্যে, কাজ না থাকলে চিন্তায়। ঘুমের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে কাজ। গত তিন বছরে এর বাইরে সে আর কিছু করেছে মনে করতে পারে না, এমনকি ছুটির

দিনেও। জয়িতার অনুযোগে মাঝে মাঝে কান দিলেও কার্যত সব অনুযোগ পুষিয়ে দিয়েছে বা চেষ্টা করেছে সে-জন্যে, অন্যভাবে—অর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে। তিন বছরে, আলিপুর নিয়ে, অন্তত চারবার বাসা বদল করা হলো। স্কোয়ার ফুটের ক্রমবর্ধমান হিসেব দিয়েই এখন সে পরিমাপ করতে পারে নিজেকে।

ইতিমধ্যে তুই থেকে পাঁচে পৌঁচেছে পাপু। আরো মসৃণ হয়েছে জয়িতার ত্বক—ছোটো হয়েছে চুলের বহর, দীপ্ত মনে করতে পারে না শেষ কবে খোঁপা বেঁধেছিল জয়িতা। মনে করতে পারে না শেষ কবে সপরিবারে বাইরে বেরিয়েছিল সে—খুঁজতে সেই বিরল মুহূর্ত, যাতে, শুনেছে, অনেকেই অভ্যস্ত। বেরুনো বলতে সোসাল কল্—একে কি একান্ত বলা যাবে? নাইট শোয়ে সিনেমা? হ্যাঁ, গেছে; কিন্তু পাপুকে আয়ার কাছে রেখে, জয়িতাকে হিচড়ে নিয়ে, কিছুটা অশান্তি এড়াবার জন্যে—ধর্মভীরু নাস্তিক যেভাবে ছুটে যায় রবিবারের গীর্জায়। এ-সব সময় মনে পড়ে পাপুকে। পাপুর মুখে তার আদল, কিন্তু সংস্পর্শে দূরত্ব অনেকখানি। বিষয়টা বুঝতে পারে যখন দিনান্তে অফিস থেকে ফিরলেও কাছে আসার জন্যে তেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে না পাপু, আয়ার সামনে ব'সে যখন সে আপন মনেই পাতা উলটে যায় ছবির বইয়ের, আর চকিত হয়ে ওঠে কলিং বেলের শব্দে—কোনো নির্দেশ ছাড়াই ছুটে যায় বাবা-মা'র সান্নিধ্য থেকে নিজের ঘরে, আয়ার কাছে, নির্বাসনে। মনে পড়ে, ড্রাইভারের বদলে একদিন সে নিজেই গিয়েছিল স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে পাপুকে—ভেবেছিল অবাক হয়ে যাবে ছেলে। কিন্তু, অবাক হতে হলো নিজেকেই, যখন তাকে দেখেও তেমন কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না পাপু, শুধু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এলে যে?' নিজের সন্তান ব'লে নয়, বস্তুত ওইটুকু ছেলের অমন নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর নিজের কানেই কেমন বেমানান শোনাল দীপ্তর। সেদিন সে এতোই অভিভূত হয়েছিল যে পাপুর পিছনে বসায় আপত্তি করেনি কোনো। ফেরার পথটুকু অতিক্রম করেছিল নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে? হয়তো নয়, হয়তো ওরই মধ্যে দীপ্ত খুঁজে পেয়েছিল নিজের পাঁচ বছর বা আর-একটু বেশী বয়সটাকে। স্কুল ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এসেছে—গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মুঠোয় স্টেথ্‌স্কোপ ধরা এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, কব্জিবন্ধ ফুলশার্ট আর ধুতি, মাথার ঠিক মাঝখানে সিঁথি ক'রে দু'পাশে নামানো কালো চুল আর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ—বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে তাকে তুলে দিচ্ছে রিক্সায়। রিক্সার অপরিসরে পিছনে বসার সুযোগ ছিল না, থাকলেও বসত কি! তাহ'লে বাবার হাত থেকে নির্ভয়ে স্টেথ্‌স্কোপটা কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নেওয়ার সুযোগ হতো না; এবড়ো খেবড়ো প্রায় গ্রাম্য রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে বলতে পারত না: 'বড়ো হ'লে আমি তোমার মতো ডাক্তার হবো।' প্রায়ই বলত কথাটা, স্টেথ্‌স্কোপের মধ্যে দিয়ে শুনত নিজের হৃৎস্পন্দন। 'হও, কিন্তু অ্যালোপাথ হতে হবে—', কম কথার মানুষ ছিল বাবা, নিজেকে প্রকাশ করত স্বচ্ছ হাসি দিয়ে, 'কতো রোজগার করবে, কতোজনের রোগ সারাবে, লোকে মানবে কতো!'

অভ্যাসটা যায়নি এখনো। তবে তফাৎ হয়ে গেছে একটু। রোগাক্রান্ত, এখনো সে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। শব্দের ধরনটাই যা আলাদা। কথাগুলো মিলে যায় কেমন, দিন গেলে শুধু বদলে যায় তাদের ধ্বনি, অর্থ, সম্মোহন! আকাশ দেখতে গিয়ে একটু আগেই সে ফিরে পেয়েছিল নিজের শিলীভূত সন্তানকে; পাপুকে খুঁজতে গিয়ে ফিরে পেল শুধু তার প্রশ্ন!

অবসন্নভাবে চেয়ারের পিছনে মাথা হেলিয়ে চতুর্থ সিগারেটটি ধরাল দীপ্ত। যেন একটা জটিল অঙ্ক মেলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—ইনভিজিলেটর দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, যে-কোনো মুহূর্তে এসে দাবী করবে উত্তর। কারণ খুঁজতে গিয়ে ছুঁতে পারে শুধু এই মুহূর্তের অসহায়তাকে, খুব সঙ্গোপনে যার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অল্প একটু ব্যর্থতাবোধ।

মীটিংয়ে—পুরো টীম নিয়ে। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌স্ নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি ছাড়ছে বাজারে; নতুন এই দ্রব্যটির চাহিদা আর কাটতি বাড়াবার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করবে বিজ্ঞাপনে। একেবারে নতুন অবশ্য বলা যায় না। মাস ছয়েক আগে একবার ছাড়া হয়েছিল বাজারে, চলেনি তেমন: খোঁজ নিয়ে ধরা পড়ল, যে-দামে ও যাদের মধ্যে এই কফি চালানোর চেষ্টা হয়েছিল, প্রথম প্রথম তারা উৎসাহ দেখালেও, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকেনি। বিক্রি কমতে থাকল। শেষে এমন এক স্তরে নেমে এলো সমস্ত ব্যাপারটা, যখন ডীলাররাও আর স্টক করতে রাজী হলো না। প্রায়-নতুন অবস্থাতেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলো কফিটা। সেই একই কফি এখন আবার নতুন নামে বাজারে ছাড়বার কথা ভাবছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌স্, ভাবছে নতুন ক'রে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করতে। এমন এক পরিকল্পনা যা সত্যি কার্যকর হবে—আর কোথাও ঘা খাবে না।

স্টারলেট হিউম স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের পুরনো এজেন্সী। শুধু কফি নয়, গত পনেরো বছর ধ'রে গ্রীভ্‌সের তৈরি অন্যান্য জিনিসেরও বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা তারাই করছে। গ্রীভ্‌সের বিশ্বস্ত। সেই বিশ্বস্ততা চিড় খেল এতোদিনে এসে—নতুন কফিটা মার খাবার পর। এখন গ্রীভ্‌স্ একেবারে নতুন ক'রে ভাবছে—স্টারলেট ছাড়াও ক্রিয়েটিভ গ্রুপ আর দীপুদের হিন্দুস্থান ফস্টারকে ডেকেছে ক্যাম্পেন তৈরি করার জন্যে। অসুবিধে হলো, ক্যাম্পেন তৈরি করা আর ব্যবসা পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। ঢের কাঠখড় পোড়াতে হবে সে-জন্যে, চালতে হবে কৌশল—যার সঙ্গে, আপাতত, কাজের সম্পর্ক নেই কোনো। তার একটি, সিন্‌হাকে মুঠোয় রাখা। নতুন পরিকল্পনায় অনেকটাই হাত আছে তার, সিন্‌হা বিগড়ে গেলে ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যেই ক্ষতি হয়েছে স্টারলেটের। চক্ষুলজ্জায় এবারও ক্যাম্পেন তৈরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের, কিন্তু স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের কফি একাউন্ট যে ওরা পাচ্ছে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সিন্‌হাই পেতে দেবে না।

অথচ, দীপ্ত জানে, আগের বারের পরিকল্পনায় খুব একটা ভুল ছিল না স্টারলেটের। ভুল ছিল বাজার, ক্রেতা ও নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি সম্পর্কে গ্রীভ্সের ব্যাখ্যায়; নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে এজেন্সীকে দোষ দেওয়ার সহজতম পথটি বেছে নিয়েছে সিন্হা। স্বাভাবিক। আরো স্বাভাবিক সিন্হার মতো মানুষের পক্ষে। ক'দিন কথাবার্তা বলেই বুঝেছে দীপ্ত, মার্কেটিংয়ে সিন্হার অভিজ্ঞতা কম; বোধ আরো অস্বচ্ছ। লোকটা ভালোবাসে নিজেকে জাহির করতে। কথা শুনে ছুঁচলো হয়ে আসে জিব, বল্স্…! কিন্তু, বলা যাবে না এ-কথা। যতোক্ষণ স্বার্থ আছে, অন্তত ততোক্ষণ মেনে নিতে হবে সিন্হাকে।

দীপ্ত জানে, সহজে ভুল করার মতো এজেন্সী স্টারলেট নয়। বিজ্ঞাপন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও টীম-ওয়ার্কের তুলনা হয় না কোনো, প্রফেসানাল নলেজেও। এজেন্সীতে চাকরি করতে এসে সে প্রথম ঢুকেছিল স্টারলেট হিউমে। সেখানে, প্রায় বছর তিনেকের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছিল কীভাবে কী হয়—চিনেছিল রামতনু সোম আর নির্মল সেনের মতো তুখোড় বিজ্ঞাপনবিদ্দের। বিশ্বাস হয় না, মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে এ-রকম ভুল করবেন তাঁরা! হয়তো এ-সব এড়ানো যেত, যদি বাজারে নতুন কফি ছাড়ার সময় স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্সের মার্কেটিং ডিরেক্টর অশোক মুখার্জী অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে না যেতেন, যদি তাঁর অপারেশন না হতো; যদি, এ-সব কারণে, সিন্হা একাই ব্রীফিংয়ের দায়িত্ব না নিত!

দীপ্ত জানে। গ্রীভ্সের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরেই সে ফোন করেছিল স্টারলেটে রবীন দত্তকে। রবীন আর সে একই সঙ্গে জয়েন করেছিল স্টারলেটে, সম্পর্কটা তুই-তুকারির। এতোদিনে বেশ উঁচুতে উঠে গেছে রবীন। গলা শুনেই বলল, 'কী বলবি, গ্রীভ্সের কফি-একাউন্ট পাচ্ছিস, এই তো?'

এতো সরাসরি কথাটা উত্থাপিত হবে ভাবেনি দীপ্ত। দ্বিধায় বলল, 'হঠাৎ কী হলো তোদের?'

'হবে আবার কি ! দে আর নট হ্যাপি।'

'কারণ !'

'কারণ ?' ওরই মধ্যে ব্যঙ্গে হাসল রবীন, 'দে থট্‌ উই ওয়্যার নট এনাফ্‌ প্রফেসানাল দিস্‌ টাইম।'

'হু সেড্‌ দিস্‌ ?'

'সে অনেক ব্যাপার। ফোনে বলা যাবে না—'

'আই সী।' দীপ্ত বলল, 'তুই কি আর গ্রীভ্‌স্‌ হ্যাণ্ডেল করছিস না ?'

'করছি এখনো। তবে আর বোধহয় করা ঠিক হবে না। আমি অলরেডি ম্যানেজমেন্ট্‌কে বলেছি, আমাকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে—'

'বুঝেছি। গণ্ডগোলটা তাহ'লে তোর সঙ্গেই হয়েছে !'

'ঠিক তা নয়।' ফোনের দূরত্ব থেকেও বুঝতে পারল দীপ্ত, হাসি ভাসছে রবীনের ঠোঁটে। একটু বা বিষণ্ণ। থেমে বলল, 'তুই তো আমাকে জানিস, দীপ্ত, আমি কি গণ্ডগোল করার ছেলে ! আই হ্যাভ দি বেস্ট্‌ অফ্‌ রিলেসন্‌স উইথ অল মাই ক্লায়েণ্ট্‌স। আসল কথা হলো, মদ-টদ আজকাল আর খাই না, ম-এর বাতিক নেই, আই বিলিভ ইন স্ট্রেট ডীল। তাতে যদি কারুর না পোষায়, ওয়েল, আই অ্যাম হেল্‌প্‌লেস্‌ ! এ শালার অ্যাডভার্টাইজিং আর ভালো লাগছে না। ঘানির বলদের মতো শুধু তেল বের ক'রে যাও। এর চেয়ে বেশ্যা হ'লে অন্তত মাসে তিন চারদিন ছুটি পাওয়া যেত—'

'বুঝেছি। তোর টায়ার্ড লাগছে ··'

রবীন বলল, 'ভাবছি, ছেড়ে দেবো।···তোর খবর বল, চেষ্টা করছিস কফি একাউন্টের জন্যে ? একটু বুঝেসুঝে লড়িস···'

দীপ্ত পরামর্শ চায়নি, ঘটনাটা জানতে চেয়েছিল শুধু। রবীনকে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। এটা ঠিক, ব্যবসার জন্যে, আরো ভল্যুম বাড়ানোর জন্যে, ছুটতে তাকে হবেই। যে-কোনো মূল্যে। প্রফেসান সম্পর্কে রবীনের ধারণায় আস্থা নেই তার। এই

মানসিকতা নিয়ে বিজ্ঞাপন জগতে, অন্তত এ-দেশে, প্রসপার করবে, এ দুরাশা মাত্র। আসলে রবীন একটু বেশী স্পর্শকাতর, একটু আলাদা, তাই একটু বাড়িয়ে ভাবছে। আর একটু এগোলে দেখতে পেত অগিলভিকে ; অল্প দূরত্বে খুঁজে পেত রামতনু সোমকে !

এটাও এক ধরনের প্যানপ্যানানি, জল না-ছুঁয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা। কেউ পারে ! বলা যেত, তোর পক্ষে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। সেটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাবে ভেবে কথাটা ঘুরিয়ে দিল দীপ্ত।

'তুই একটুও বদলাসনি—'

'বলছিস !' এবার গলা ছেড়ে হাসল রবীন। 'একদিন সময় ক'রে জানা আমাকে—মাল-টাল খাওয়া যাবে। তুই তো এখন বস্ হয়েছিস ! ব্যস্ত ! আমিই ডাকছি—'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না দীপ্ত। দেখাশুনো হ'লে রবীন হয়তো আরো কিছু বলবে, কাজ শুরু করার আগে জানাও দরকার সবকিছু। স্বার্থটা তার। বলল, 'একদিন কেন, লেট আস মেক্ ইট টুমরো। লাঞ্চ আওয়ারে। কোথায় বলতে হবে ?'

'না। আমি চ'লে আসব।'

ফোনে যা বলতে পারেনি রবীন, বলেছিল পরে। দ্বিধায় পড়েছিল দীপ্ত। রবীন যা বলছে, তার সবটাই কি তাকে সাবধান করার জন্যে, নাকি আর-একটা উদ্দেশ্যও কাজ করছে আড়ালে—যাতে, অন্তত তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েও, প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায় দীপ্ত ! হয়তো তাতে ব্যক্তিগত কিছু সুবিধে হবে রবীনের। এমনও হতে পাবে, স্টারলেটও বেঁচে যাবে। খুব বেশী দিনের এজেন্সী নয় ক্রিয়েটিভ গ্রুপ ; ইদানীং কয়েকটা ভালো ক্যাম্পেন তৈরি করলেও ওরা বম্বে-বেস্ড্, মালিকানা পার্শী। সিন্হার কথা বাদ দিলেও, মুখার্জীর যে-রকম বাঙালী-প্রীতি, তাতে, হয়তো সেই কারণেই, একটা লাইফ পাবে রামতনু সোমের এজেন্সী—যদি হিন্দুস্থান ফস্টার সরে দাঁড়ায়। সমস্যা ! যদি সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য থাকে রবীনের, একদা'র ঘনিষ্ঠতা স্মরণ ক'রে দীপ্ত কি সরে দাঁড়াবে !

একটু অস্বস্তি বোধ করছিল দীপ্ত। এই একটা ক্ষেত্র, যেখানে সে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এইখানে এসে বুঝতে পারে, সে হিন্দুস্থান ফস্টারের অনেকখানি হলেও শুধু তাকে নিয়েই হিন্দুস্থান ফস্টার নয়। ভাবতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে, আর কোথাও না হোক, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে।

ইতিমধ্যে জয়িতার সঙ্গেও আলোচনা করেছিল সাদা মনের যুক্তি বোঝার জন্যে। রবীনকে জয়িতাও চেনে, সম্ভবত পছন্দও করে।

'ইউ মাস্ট হেল্‌প্ রবীন।' শুনেই বলল জয়িতা, 'হি ইজ এ নাইস ম্যান। তোমার মনে আছে, পাপুর জন্যে কীভাবে বেবীফুড জোগাড় ক'রে আনতো!'

দীপ্ত হাসল, তার পক্ষে অস্বাভাবিক হাসি। প্রায় কৌতুকের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'জয়ি, তুমি তোমার বাবার মেয়েই থেকে গেছ! এখনো আমাব স্ত্রী হতে পারো নি!'

'তার মানে!'

'আছে—'

আত্মস্থ হয়েছিল দীপ্ত। সিদ্ধান্ত কিছু নিতে হ'লে এখনই নিতে হবে। সময় নেই, ক্যাম্পেন সাবমিট করতে তিন সপ্তাহের বেশী সময় পাওয়া যাবে না। মনে হয় সে এখনো চালিত হচ্ছে বিবেকের দ্বারা—রবীন যেমন বলেছিল; না হ'লে এতো ইতস্তত করবে কেন!

অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে দেরী হয়নি। ক্রমশ বুঝেছিল, বিবেক তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। স্বার্থ আর বিবেক একই স্রোতের বিভিন্ন ঢেউ নয়—এ-ক্ষেত্রে, এগোতে চাইলে, তাকে এগোতে হবে বিবেক ভাসিয়ে। যে-কোনো উপায়ে। একই যুক্তি দেখিয়েছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনয় চৌধুরীও, তাঁর বাড়িতে, একটু বা বিভ্রান্ত দীপ্ত ছুটে যাবার পর—'ইজ দ্যাট দি প্রব্‌লেম দ্যাট ব্রট ইউ হিয়ার!' বিস্ময় নয়, যেন চাবুকই চালানো হলো আলতো হাতে!

কম কথার মানুষ চৌধুরী, যখন বলেন এইভাবেই বলেন, সোজাসুজি, কখনো বা শ্লেষ মিশিয়ে—যাতে দ্বিতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা না হয়। হয়তো এটারও প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু, আজকের সমস্যা আলাদা। দীপ্ত জানে না, আজকের সমস্যা বস্তুত কী ও কেমন—সকালের ঘটনা কেন তাকে এমন অবিন্যস্ত ক'রে দিচ্ছে! বুঝতে পারে নি, ঠিক কোন মুহূর্তে শুরু হয়েছিল তার অন্যমনস্কতা। জয়িতার খুশীমতো তাকে নামিয়ে দিয়েছিল মার্গারেটায়—চুল তৈরি করবে; তারপর অফিসে পৌঁছে, প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে মীটিং করেছে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের ক্যাম্পেন নিয়ে। আলোচনা করেছে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে। যদি এই একাউন্টটা পায়, কলকাতা ব্রাঞ্চের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই হবে তার প্রথম সাফল্য। বস্তুত, কাজ করার ব্যাপারে সে একটা বাড়তি আগ্রহ বোধ করছিল ক'দিন ধ'রে। তারপর, মীটিং রুম থেকে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎই একটি প্রশ্নে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল সব—'কী ব্যাপার, আজ একটু গম্ভীর-গম্ভীর লাগছে! কিছু হয়েছে নাকি!' আকস্মিক প্রশ্ন; ঠিক কে যে করল তা পর্যন্ত দেখার উৎসাহ পেল না দীপ্ত। 'নো। নাথিং—', স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এলো উত্তরটা। সম্ভবত তখনই একটু-একা হতে চেয়েছিল সে, চেয়েছিল নিয়ন্ত্রিত তাপের মধ্যে সঁপে দিতে নিজেকে, চ'লে যেতে নিজস্ব আড়ালে। সময় চ'লে যায়।

আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে সময় নিল দীপ্ত। কী ভেবে, ফোন তুলে অপারেটরকে বলল বাড়ির লাইন দিতে। জয়িতা নিশ্চয়ই ফিরে গেছে এতোক্ষণে; পাপুরও পৌঁছুনোর কথা সাড়ে বারোটার মধ্যে। এখুনি একটা কথা বলা দরকার জয়িতাকে।

অল্প-ফাঁক দরজার বাইরে টুক্ টুক্ শব্দ। 'ইয়েস—' বলতেই ঢুকে পড়ল সমীরণ। আড়ে তাকিয়ে দীপ্তর মনে হলো, তখন প্রশ্নটা সমীরণই করেছিল।

'প্ল্যানটা দেখলে নাকি, বস্?'

'না—।' সামনে দিস্তাখানেক কাগজে ক্লিপ্ আঁটা। মীটিং রুম থেকে বেরিয়েই সে এগুলো দেখবে ভেবেছিল; দেখে, সংশোধন ক'রে, অবিলম্বে টাইপিংয়ে পাঠানোর কথা। হয়নি। তা হোক, এখন আর কোনো দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেবে না। গুরুত্ব না-দেওয়া গলায় বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি, সময় পাইনি এখনো।'

'তা পাবে কেন, গুরু!' সামনে যে-কোনো একটা চেয়ারে বসবার উদ্যোগ করল সমীরণ, ঠিক সাহস হলো না। যে-রকম গম্ভীর হয়ে আছে, হঠাৎ ফায়ার ক'রে বসতে পারে। বসিং পেয়ে বসছে দীপ্তকে! তবু, হাল্‌কা ভাবটা বজায় রেখেই বলল সমীরণ, 'তোমার জন্যে আমিই শুধু রাত জেগে খেটে ম'লাম!'

'আমার জন্যে! কাম অন্—', ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ছুলে গেল দীপ্তর, 'দিস ইজ নট মাই পার্সোনাল ওয়ার্ক্!'

সমীরণ দমে গেল। দীপ্তকে সে চেনে, চেনে তার প্রতিটি অভিব্যক্তিকে। তবু অপরিচিত লাগে মাঝে মাঝে। যেমন এখন। দাঁতে নখ কাটতে কাটতে সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজল সমীরণ। সকালে, প্ল্যান্স্ বোর্ডের মীটিংয়ে, টারগেট গ্রুপ বিন্যস্ত করা নিয়ে নিখিল মুস্তাফীর সঙ্গে একটু মন কষাকষি হয়েছিল দীপ্তর। নিখিলের বক্তব্য মার্কেট ডিফাইন করা হয়নি ঠিকভাবে, সম্ভবত রিসার্চের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্তব্যটা খুশী করেনি দীপ্তকে; হঠাৎই বলেছিল, 'এক্সপার্টের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।' নিখিল এরপব গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে, আর কোনো আলোচনায় অংশ নেয়নি এবং অশোভন না-দেখানোর সময় পার করেই উঠে চ'লে যায়। সম্ভবত দু'জনের সম্পর্ক ইদানীং খারাপ হয়েছে আরো। এটা এক হিসেবে ভালোই, ভাবল সমীরণ, যতোক্ষণ এটা বজায় থাকবে, অন্তত ততোক্ষণ সুস্থির হতে পারবে না দীপ্ত। আপাতত দীপ্তকে খুশী করার জন্যে একটা সুযোগ নিল।

'ও, কে, বস্। তুমি দেখে নাও আগে।·· আমি এসেছিলাম অন্য ব্যাপারে। একটা স্কুপ আছে—'

'স্কুপ!'

সুযোগ বুঝে চেয়ার টেনে বসল সমীরণ। হাত বাড়াল দীপ্তর প্যাকেটের দিকে।

'তুমি তো কোম্পানীর জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছ। তলে তলে সাবোটাজ হচ্ছে খেয়াল রাখো!'

'হোয়াট!'

সন্দেহে সোজা হয়ে বসল দীপ্ত। ভুরু কোঁচকালো। অনেক-ক্ষণের মধ্যে এই প্রথম টান পড়েছে মেরুদণ্ডে। রিং হচ্ছে। দ্রুত হাতে রিসিভারটা তুলে কানে দিল। ওদিকে জয়িতা। লাইনটা সে নিজেই চেয়েছিল, এখন কিছু না ব'লে ছাড়া যাবে না।

'তুমি পৌঁচেছো কিনা খোঁজ নিচ্ছিলাম—'

'হঠাৎ! নো ওয়ার্ক টু-ডে?'

জয়িতা এ-কথা বলতে পারে। ধরা-পড়ার ধরনে হাসল দীপ্ত: সুবিধে এইটুকু, জয়িতা তার অস্বস্তি টের পাচ্ছে না। ভেবে বলল, 'গাড়িটা ফিরে আসেনি এখনো, তাই…'

'পাপু এই ফিরল, জাস্ট নাও। এখুনি পেয়ে যাবে।'

'ও, কে। ছাড়ছি তাহ'লে—'

প্রতারণা, আশ্চর্য, তাহ'লে সময় বিশেষে নিজের সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারে সে! খানিক আগে বিবেক নিয়ে ভেবেছিল। পূর্বাপরহীন সংক্রমিত অবস্থার মধ্যে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, সাতদিন আগে পাওয়া মা'র চিঠিটার জবাব দেওয়া হয়নি। জয়িতাও দিতে পারত—কী এমন ব্যস্ত সে! এমনকি মাকে টাকা পাঠানোর কথাটাও মনে পড়েনি এর মধ্যে। হঠাৎ খসে-পড়া বাদামি পাতার মতো একটা আবেগ দুলে দুলে নামছিল—স্মৃতি থেকে বোধের দিকে। জয়িতাকে খুঁজেছিল সেইজন্যেই। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো প্রসঙ্গ এখন পড়ে রয়েছে সামনে। সন্ধ্যায় ফিরে যাবে বাড়িতে, তখন কি আর মনে পড়বে না মাকে! স্লিপ বক্স থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে বড়ো বড়ো হরফে দীপ্ত লিখল: MOTHER, যতো দ্রুত লেখা যায়। সেটা ভাঁজ ক'রে রাখল পকেটে, একটা সিগারেট টেনে নিল। হিসেবমতো সমীরণই

এখন লাইটারটা জ্বেলে ধরবে।

'সাবোটাজ মানে?'

'গেস্‌—'

'আই কান্‌ট্‌ গেস্‌।' ভারী গলায় বলল দীপ্ত, 'যা বলার সোজাসুজি বলো, আমার কাজ আছে—'

'দ্যাট ব্লাডি মুস্তাফী—', অপ্রস্তুতভাবে হাসল সমীরণ, 'শুনলাম, স্টারলেট হিউমে গিয়েছিল কাল!'

'তাতে সাবোটাজের কী হলো?'

'হলো না!' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায় গলার স্বর চড়িয়ে দিল সমীরণ, 'আমাদের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি ফাঁস ক'রে দিতে পারে। খুব সিমপ্‌ল! নির্মল সেনের সঙ্গে খাতির আছে ওর!'

'সো, দ্যাট্‌স্‌ ইওর কেস্‌!'

দীপ্ত হাসল, বেশ ছড়িয়ে। অপ্রয়োজনীয় ভেবে সিগারেটটা গুঁজে দিল অ্যাশট্রেতে।

'সমীরণ,. আমি তোমাকে লেটেস্ট স্কুপ্‌ দিতে পারি। মুস্তাফী যায় নি, নির্মল সেনই ফোন করেছিল মুস্তাফীকে—আমরা কবে ক্যাম্পেন প্রেজেন্ট করছি জানতে—'

'আলবাত্‌ গিয়েছিল—'

'ডোণ্ট গেট্‌ এক্‌সাইটেড্‌। যায় নি। ফোনটা এসেছিল আমারই এখানে, নিখিল এখানেই ছিল—'

যতো দ্রুত উঠেছিল, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো সমীরণ। প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলল, 'আজ মীটিংয়ে শালাকে আর একটু টাইট দিলে পারতে। অডাসিটি! তোমাকে কিনা চ্যালেঞ্জ করে!'

'সমীরণ!' থামিয়ে দিল দীপ্ত। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার আর কিছু বলার ছিল? আমি নোটটা দেখে নিতে চাই। প্লীজ!'

'ঠিক আছে। পরে ডেকো আমাকে—।'

চ'লে গেছে। বন্ধ দরজাটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল

দীপ্ত। আত্মবোধ ব'লে দেয় মনুষ্যচরিত্র বোঝায় অধিকার আছে তার। তবু খটকা লাগে মাঝে মাঝে—যা ভাবছে তা ঠিক তো! কী উদ্দেশ্য ছিল সমীরণের? তাকে খুশী করা! এ-অফিসের পঁচানব্বুই ভাগ কর্মীই তা করবাব চেষ্টা কবছে সারাক্ষণ—এমনকি তারাও, যারা, তার পদোন্নতি হওয়ার আগের দিন পর্যন্তও, তাকে দেখত অবহেলার চোখে। ঘৃণাও কি ছিল না?

বয়স আর অভিজ্ঞতায় নিখিল মুস্তাফীর জোর তখন অনেক বেশী। ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজাব কৃষ্ণাণ চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, হাওয়ায় গুজব ছিল মুস্তাফী আসছে সে-জায়গায়। তার কথা ওঠেনি। লক্ষ্য থাকলেও, সে নিজেও খুব একটা আশা করেনি। তবু ক্ষীণ একটা স্বপ্ন নির্মেঘ আকাশে দূর বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝিলিক দিত মাঝে মাঝে। কারণও ছিল। বছরখানেক আগে হিন্দুস্থান ফস্টাব ছেড়ে চ'লে যায় কিরমানি লিমিটেড। ছোটো একাউণ্ট, বিজনেস ভল্যুমের দিক থেকে তেমন কিছু নয়। দেখাশোনা কবত নিখিল মুস্তাফী। একাউণ্টটা চ'লে যাবার ব্যাপারে হয়তো নিখিলেরও ভূমিকা ছিল না ততো। কিন্তু ওই ব্যাপারেই ক্ষুব্ধ হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর ধারণা সময় থাকতে সচেতন হয়নি নিখিল, ক্লায়েণ্ট সার্ভিসিংয়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। দিলে হয়তো দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

সন্দেহ নেই, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল সে। কিছুদিন মুস্তাফীকে দেখলেই জ্বলে উঠত গা, পার্টিতে দাঁড়িয়ে পা কাঁপত অল্প অল্প—ইচ্ছে হতো মুস্তাফীর চওড়া কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছুঁড়ে মারে হুইস্কির গ্লাস! আশাহীনতা থেকে কেন সে একটা দাবী সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিল মনে—এমনকি ঘুমের মধ্যেও টেনে এনেছিল দুঃস্বপ্ন, আজও তা অনুমান করতে পারে না দীপ্ত। সম্ভবত রক্তই তাকে চালিত করেছিল এই ভবিতব্যের দিকে—যেখানে মনের মধ্যে পিঁপড়ের জল সেঁচার মতো শুধুই ঘোরাফেরা করে হননের চিন্তা!

মনে হয় সেই অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছে এখন। আস্তে আস্তে

অনেক বেশী সহিষ্ণু হয়েছে সে। সমীরণ তা বুঝবে না। এমনও হতে পারে, দীপ্তর ছেড়ে-যাওয়া চক্রান্তের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অন্ধ সেনাপতির মতো এখনো মুস্তাফীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সমীরণ, লড়াই থেমে যাবার পরও। সমীরণ কি জানে, দীপ্তর জায়গা থেকে এখন তার চেয়ে অনেক বেশী সহনীয় দেখায় নিখিলকে? নাকি এইভাবে, তাকে উত্তেজিত ক'রে, একদা-সাহায্যের প্রতিদান চাইছে সমীরণ? হাঃ! স্টুপিড! 'বাস্টার্ড' কথাটা আর ভাবল না দীপ্ত।

ইচ্ছে করছে ছড়িয়ে যেতে একটু। ব্যাকরেস্টে মাথাটা হেলিয়ে শরীরটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিল দীপ্ত। নিখিলের সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছিল নিখিল, পরে বুঝেছে দীপ্ত—তখনও বোঝেনি তা নয়। আসলে হঠাৎ অহঙ্কারে ঝল্‌সে উঠেছিল সে; না হ'লে, পরামর্শটা মেনে নিলে, অন্যরা অপরিণত ভাবত তাকে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুল জবাবটা বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ দিয়ে।

না, একবার যাওয়া দরকার নিখিলের কাছে। ক্ষমা না চাক, অন্তত দূরত্বটা ঘোচানো দরকার।
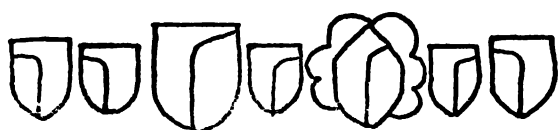
পরিচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে কেটে যায় কয়েকটি দিন। মাথার মধ্যে চক্রাকারে ঘোরে একটি মাত্র শব্দ—ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন, ক্যাম্পেন। তিনটি সপ্তাহ যেন তিনটি দিন। আর দিনগুলিও তেমনি- মুহূর্ত দিয়ে গড়া ; ঘণ্টা, মিনিটের সমবায় নেই কোনো। পরিশ্রম অমানুষিক। কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠে সহনীয়, যখন কাজ করতে করতেই আবিষ্কারের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন। আরো নতুন কিছু তথ্য, ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রলুব্ধ করার মতো অভিনব কোনো উপায় হানা দেয় মাথায়। তারপর একটা সময় আসে যখন ব্যবসার প্রয়োজনটাও হয়ে দাঁড়ায় গৌণ : ভুলে যেতে হয় একই লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে প্রতিযোগিরাও—একজনের সাফল্য নির্ভর করছে আর-একজনের মুখ থুবড়ে পড়ার ওপর।

প্রেজেন্‌টেসনের আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হলো দীপ্তকে। উদ্বেগ প্রায় শূন্য ক'রে দিচ্ছে। একা নয় ; এ-কাজ একার হতে পাবে না। তবু দায়িত্বটা তারই। জানে, সাফল্য যদি আসে, যদি নতুন এই একাউণ্টটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় হিন্দুস্থান ফস্টারে, তাহ'লে খ্যাতিটা তারই হবে। বাকিটুকু যাবে টীম-ওয়ার্কের নামে—ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নোটিশ পড়বে বোর্ডে, চেনা শব্দে।

যদি না আসে? যদি এমন কিছু হয়···একদিনেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সমস্ত আশা!

এই চিন্তাটাই মাঝে মাঝে দুলিয়ে দেয় দীপ্তকে। ক'রে তোলে অন্যমনস্ক ; অভিজ্ঞতার বাইরে সে খুঁজে চায় আরো-এক সম্ভাবনা, যার নাম ভাগ্য! কাজকর্ম সবদিক থেকেই ভালো হয়েছে। বলতে কি, সর্বস্তরে এমন গোছানো কাজ অনেকদিন হয়নি হিন্দুস্থান ফস্টারে। এমন কোনো খুঁত দেখছে না যাতে চিড় ধরতে পারে

আত্মবিশ্বাসে। তবু, বিশ্বাস নেই রামতনু সোমকে—সম্মান নিয়ে যেখানে টানাটানির প্রশ্ন, সেখানে দীপ্তকে কি ক্ষমা করবেন তিনি! আহত মর্যাদা থেকে তিনি কি বের করবেন না এমন কোনো অস্ত্র, যাতে সহজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে দীপ্ত! কী ক'রে ভুলবেন তিনি, একদা তাঁরই ছায়ায় প্রতিপালিত, 'সেদিনের ছোকরা' দীপ্ত রায় অহঙ্কার ও বুদ্ধিশাণিত হয়ে এখন হাত বাড়াতে চাইছে তাঁরই সাম্রাজ্যে!

এ-ছাড়াও ভাবনা ছিল। স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টর মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দীপ্ত নিজে এখনো আড়ালে। তার যতো চর্চা সবই সিন্‌হার সঙ্গে। যতোই তৎপর হোক সিন্‌হা—ক্যাম্পেন অ্যাপ্রুভ করার ব্যাপারে মুখার্জীর ওপর কথা বলবে না কোনো। অথচ, রামতনু সোমের প্রধান জোর মুখার্জীই। ক্যাম্পেন ও প্রেজেন্-টেসন ভালো হওয়া সত্ত্বেও এমন কি হতে পারে, শেষ মুহূর্তে এই চালেই হার হবে তাদের!

সন্দেহ নিরসনের জন্যে ক'দিন আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছিল দীপ্ত। তিনি ভাবেন নিজের মতো ক'রে। দীপ্তর উদ্বেগকে কোনো আমল না দিয়েই বললেন, 'সেটা যেন আমাদের একাউণ্টটা না-পাওয়ার অজুহাত না হয়। মুখার্জী ফেয়ার ডীলে বিশ্বাস করেন। সুতরাং –', একটু থেমে বললেন, 'আই বিলিভ ইউ হ্যাভ রিয়েলাইজ্‌ড্‌ দি পয়েণ্ট!'

'আই হ্যাভ, স্যার।'

চোয়াল কঠিন হয়ে ওঠে দীপ্তর। সূক্ষ্ম একটা অপমান ছুঁয়ে যায় তাকে। আর একটি বা দুটি ধাপ, ভাবে, একদিন এই কথারও জবাব দেবে সে; বক্রোক্তি ফেরৎ দেবে ঠিক আজকের ভাষায়। একদিন, কিন্তু আজ নয়। আপাতত নয়। মুস্তাফীর ওপর বিনয় চৌধুরী বিরূপ হওয়ার পর ভেবেছিল হাওয়া তার দিকে—সম্ভবত ভুল ভেবেছিল। চৌধুরী ইদানীং তাকেও ছেড়ে কথা বলছেন না। এই সেদিন একটা এনটারটেন্‌মেণ্ট বিল পাশ করা নিয়ে কথা

শোনালেন, 'ক্ষমতা থাকার অর্থ কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করা নয়, দীপ্ত! এরপর দেখছি আমাকেই দেখতে হবে এ-সব!'

দীপ্ত বলতে চেয়েছিল, সামান্য একটা বিল পাশ করা যদি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহ'লে এর চেয়ে আরো বেশী অপব্যবহার কি আপনি করছেন না, স্যার!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক'রে এসেছিল কয়েকটি দৃষ্টান্ত। তবু বলতে পারেনি। বলার উপায় ছিল না, যোগ্যতাও না—ডিসিপ্লিন বাধ্য করেছিল চুপ ক'রে থাকতে।

আজকের রোখ সেইজন্যে আরো বেশী। যেন এই রাত জাগা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজের খুঁটিনাটি মিলিয়ে নেওয়া—অন্যদেরও জাগিয়ে রাখা, এ-সবের মধ্যেও কাজ করছে অবধারিত উদ্দেশ্য; শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের চতুর্দিক ঘিরে রাখছে কঠিন পাহারায়, যাতে সামান্য ভুলে কোথাও অসঙ্গতি না ঘটে।

এক এক সময় অবাক লাগে ভাবতে—এতোখনি স্নায়ু-পীড়নের সত্যিই কি দরকার ছিল কোনো! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান নয় সে; তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভা নিয়ে অনেক কম সুখের দিকে কতোজন হেঁটে গেছে স্বেচ্ছায়, রাতে ঘুম আর দিনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জন্যে মেনে নিয়েছে আপেক্ষিক ক্লেশ। তার ব্রিলিয়ান্স নিয়ে অনায়াসে অধ্যাপনার প্রশান্তি স্বীকার ক'রে নিয়েছে সুজন; আর, নির্মাল্য—তাদের সময়ের সবচেয়ে ব্রাইট বয়—তো সামান্য ভালো না লাগা থেকে ছেড়ে দিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি; এখন সে ছোটোখাটো একটা ইংরিজী সাপ্তাহিকের এডিটর। কাগজটা চলে না তেমন, বিজ্ঞাপন পায় না। দুপুরের চড়া রোদ মাথায় নিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যায় নির্মাল্য, ক্বচিৎ অহঙ্কার মিশিয়ে। সে তো জানে দীপ্ত এখন বিজ্ঞাপন জগতের চাঁই-বিশেষ, ইচ্ছে করলেই পারে তাকে সাহায্য করতে; তবু, দেখা হ'লে ভিতরের কোন অদম্য শক্তি প্রতিহত ক'রে রাখে তাকে! অন্যরা যদি পেরে থাকে, দীপ্ত কেন পারল না! ব্যাপক জগতের কাছে কোন অঙ্গীকার ছিল তার! নাকি সে অঙ্গীকারবদ্ধ

মা, পাপু, জয়িতার কাছে ! মনে তো হয় না। তবে ? নিজের জন্যে ! টাইয়ের নট্, জুতোর পালিশ, ড্রাইভিং আর শুদ্ধ উচ্চারণের মোহে ! যদি তাই হয়ে থাকে, কী পাচ্ছে সে পরিবর্তে ? স্বাচ্ছন্দ্য ! বিলাস ! স্তুতি !

রেকমেণ্ডেসনের টাইপ-করা ফর্মা থেকে চোখ তুলে তাকাল দীপ্ত। ঝাপ্সা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে মুখগুলি—সমীরণ, রবি, সুনীতা, বিমল, সুধাংশু, যোশী। সরল থেকে ক্রমশ বৃত্তে ছড়িয়ে পড়ছে তারা—ঘুরছে, দীপ্তকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। জলের ভিতর থেকে শিলার উদ্ভবের মতো সকাল থেকে এতোটা রাত পর্যন্ত পরিশ্রমে কঠিন হয়ে উঠেছে মুখ। রাশ ছাড়েনি তবু। ভয়ে ? নিষ্ঠায় ? নাকি সেই একই আকাঙ্ক্ষা ঘুণপোকার মতো সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে তাদেরও বুকে, দীপ্ত যার পরিমাপ করতে পারে না !

কখনো কখনো ইচ্ছে করে নিজের দিকেই ছুঁড়ে দিতে নিজেকে। 'আছি' এই অনুভূতির জন্যে প্রয়োজন হয় শব্দের, ভঙ্গিতে চকিত হয়ে ওঠে বর্তমান।

সজোরে টেবিলে একটা ঘুঁষি মারল দীপ্ত। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'কাম-অন্···রিল্যাক্স···'

দীপ্তর আকস্মিক উচ্ছ্বাস প্রায় সকলকেই বিমূঢ় ক'রে দিল। চাপা হাসিতে বেঁকেচুরে যাচ্ছে বিব্রত মুখের রেখাগুলি—বর্ষার আভাসে শান্ত নদীর জলে কাঁপন লাগার মতো। ঠিক কেন বোঝা যায় না। শুধু এটুকু বোঝা গেল তার ব্যবহারে পরিকল্পনা ছিল না।

প্রথম কথা বলল সমীরণ।

'কী হলো ! পাগল হয়ে গেলে নাকি !'

'পাগল ? আমি !' দু'দিকে দু'হাত ছুঁড়ে সবল শরীরের ঢেউ তুলল দীপ্ত, 'হ্যাঁ, পাগল হবো। তবে আজ নয়, কাল ! প্রেজেন্-টেসনের পর—'

কী মানে হতে পারে এ-কথার ! অদ্ভুত এক রহস্য যেন ঘিরে

ধরেছে দীপ্তকে। বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুঁষি ঠুকতে ঠুকতে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরে এলো সে। থামল সুনীতার চেয়ারের পিছনে এসে। ভূমিকা-বিহীন দুটি হাত ওর ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে সমীরণের দিকে তাকাল।

'স্টারলেট আমাকে আণ্ডারএস্টিমেট করছে! ব'লে বেড়াচ্ছে, আমরা বেকার চেষ্টা করছি! রিজিন? রামতনু সোম নিজে ওদের ক্যাম্পেন প্রেজেণ্ট করবে। মাই ফুট!'

দু' হাতের দশটা আঙুল চেপে বসেছে সুনীতার মাংস ও হাড়ের ওপর। পাঁচজনের দশটি চোখ ছুঁয়ে গেল সুনীতাকে। বেশী মদ্যপান করলে কখনো-সখনো একটু বেসামাল হয়ে পড়ে দীপ্ত। সচরাচর হয় না। চোখে অন্ধকার নিয়েও ওর মুঠোয়-ধরা স্টীয়ারিং কাঁপে না কখনো। সেই দীপ্ত! এখনকার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা না থাকলেও আছে উত্তেজনা; অথচ, কেউ মনে করতে পারল না, সন্ধ্যে থেকে এ-পর্যন্ত সে জল অব্দি স্পর্শ করেছে কিনা। মীটিং রুম থেকে বেরিয়ে বার দুয়েক নিজের চেম্বারে গিয়েছিল। সেও ডকুমেণ্ট ঘাটতে। তা না হ'লে সারাক্ষণ এই ঘরে, সকলের সামনে, কাজ ক'রে যাচ্ছে। এতোক্ষণ বরং একটু বেশীই সুস্থির ছিল। ইতিমধ্যে এমন কী ঘটল যাতে সে উত্তেজনা বোধ করবে এতো!

আড়ষ্টতা থেকে অস্বস্তি শুরু হলো সুনীতার। গায়ে হাত পড়েছে ব'লে নয়, দু' বছরে এ-রকম অনেকবারই তাকে ছুঁয়ে গেছে দীপ্ত। কখনো সহজে, হাল্কা মেজাজে, কখনো বা—সুনীতার ধারণা—দুর্বলতায়। স্পর্শই ব'লে দেয় কোন আবেগ কাজ করছে রক্তে। কিন্তু, এই মুহূর্তের স্পর্শে পেশী ছাড়া আর কোনো অবয়ব নেই। অস্বস্তিটা সেইজন্যেই আরো বেশী।

সম্ভবত দীপ্তও টের পেল ব্যাপারটা। হাত দুটো তুলে নিয়ে মুখটা নামিয়ে আনল সুনীতার কানের কাছে।

'আর ইউ হার্ট?'

'না, না।' সুনীতা দেখল দীপ্ত বিরক্ত নয়। সাহস পেয়ে বলল, 'বাট প্লীজ ডোন্‌ট্‌ ট্রাই ইওর স্ট্রেন্‌থ্‌ অন মী!'

'সরি, সুনীতা। ভেরি সরি!' অপ্রস্তুতভাবে হাসল দীপ্ত। আবার নিজের ধরনে ফিরে যেতে যেতে বলল, 'কথাটা ঠিকই, স্ট্রেন্‌থ্‌। জোর! বুঝলি সমীরণ, কাল আমি জোরই দেখাবো।··· বাজী রাখবি, কফি একাউন্টটা আমরাই পাচ্ছি!'

'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, গুরু।' সমীরণ বলল, একটু বা নীচু গলায়, 'কিন্তু, আগে থেকে এ-সব বলা ভালো নয়। লাকের ব্যাপারও আছে—'

'লাক্‌-ফাক্‌ নয়। আসল কথা কনফিডেন্স। নাউ আই অ্যাম কনফিডেন্ট···অবশ্য···', ভেবে বলল দীপ্ত, 'অবশ্য যদি না পাই···'

'বুঝতে হবে লাক্‌ খারাপ!'

কথাটা বলল সুনীতা। এমনভাবে, যাতে এমনকি দীপ্তও হেসে উঠল।

উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে, বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। সম্ভবত আজ এখানেই শেষ করা যাবে। ছড়ানো কাগজগুলো সাজিয়ে নিতে ব্যস্ত হলো দীপ্ত; প্রোজেকটারে ব্যাক করতে লাগল যোশী—দ্রুত ব্যবহারে রঙগুলো অদ্ভুত আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা দেয়ালে, সরে যাচ্ছে আবার। সুনীতা বাইরে গেল। শিস্‌ দিতে দিতে দীপ্তর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল সমীরণ।

'এবার বোতলটা খুললে হয় না?'

'ও, কে।' মুখ তুলে সকলকে খুঁজল দীপ্ত, 'হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, যোশী? বিমল? রবি?'

না বলল না কেউই। সমীরণ চেঁচিয়ে বলল, 'কোই হ্যায়?' ছুটে গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিল যোশী। তারপর, বেয়ারা ঘরে ঢুকতেই, সমীরণ বলল, 'নিয়ে এসো—'

সুনীতা ফিরে এলো। মুখ থেকে ক্লান্তির ভাবটুকু অদৃশ্য,

সম্ভবত এরই মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ঠোঁট জুড়ে লাবণ্য। আলোয় চিকচিক করছে কপালের ওপরের চুলগুলি।

'আমি যাচ্ছি—'

ট্রে-তে সাজানো গোটা ছয়েক গ্লাস, মাঝখানে বড়ো মাপের বোতল। টেবিলে রাখার আগেই প্রায় ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে নিল সমীরণ।

'চীয়ার্স!'

সেদিকে মন না দিয়ে সুনীতাকে লক্ষ করল দীপ্ত। মেয়েটি ভীরু। সকাল থেকে সমানে খেটে গেছে মুখ বুঁজে, কোনো অজুহাত দেখায়নি। খানিক আগে অল্প সপ্রতিভ হয়ে উঠলেও হঠাৎই যেন আবার গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ওকে সহজ করার জন্যে বলল, 'তুমি তো বাড়িতে ব'লে এসেছো দেরী হবে? বলো নি?'

সুনীতা ঘাড় নাড়ল।

'তবে? তাড়া কেন?' দীপ্ত বলল, 'কাম, জয়েন আস?'

'নো, থ্যাংস্। বাড়িতে ভাববে।'

'ও, কে। গাড়িটা নিয়ে যাও। সিন্‌স্ ইউ আর নট উইলিং...'

কথাটা শেষ করতে পারল না দীপ্ত। থেমে গেল টেলিফোনের শব্দে। ধরেছিল রবি, সাড়া দিয়ে বলল, 'মিস্টার রে, কল ফর ইউ।'

'জাস্ট এ মিনিট—'

দীপ্ত এগিয়ে গেল। যা ভেবেছিল তাই। জয়িতার গলা।

'কী ব্যাপার! এতো দেরী হচ্ছে ফিরতে!'

'আর পাঁচ মিনিট, প্লীজ!' অভ্যাসে উত্তরটা বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। ব'লে নিজের মনেই একটু হাসল দীপ্ত। এতোদূর কেতা অর্জন করার পরও কী অদ্ভুতভাবে এখনো স্ত্রীর মতো ব্যবহার করে জয়িতা!

'আগের বারও তাই বলেছিলে!' স্পষ্ট অনুযোগ ফুটে উঠল জয়িতার গলায়, 'ক'টা বাজে খেয়াল আছে!'

'জয়ি, ট্রাই টু বি সেন্‌সিব্‌ল! কাল সকালে প্রেজেন্‌টেসন—এতো পাংচুয়াল হওয়া কি সম্ভব!'

'আসছ, না আসছ না?'

'ওফ্‌!' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে উচ্চারণ করল দীপ্ত। তারপর বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই চোখাচোখি হলো সুনীতার সঙ্গে। এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এই রাতে, গভীর নিঃসম্পর্কের মধ্যে, ছ' সাতজন পুরুষের সঙ্গে একমাত্র মেয়ে। শুধু মেয়ে নয়, অসম্ভব যুবতী—এই মুহূর্তে শরীর জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে রাত! ভাবামাত্র কঠিন হয়ে উঠল পেশী। আশ্চর্য, একটু আগে এই মেয়েটির শরীরেই দু' হাতের ভার নামিয়ে দিয়েছিল সে!

অল্প ভাবল দীপ্ত, ঠিক ততোক্ষণ, যতোক্ষণে দ্বিধা থেকে অনায়াসে পৌঁছুনো যায় সিদ্ধান্তে।

'তুমি আমার গাড়িতেও আসতে পারো। আমি নামিয়ে দেবো।'

'থ্যাংক ইউ।' বাধ্য গলায় বলল সুনীতা।

ততোক্ষণে গ্লাসগুলো উঠে গেছে হাতে হাতে। দীপ্তরটা নিয়ে এলো সমীরণ।

'চীয়ার্স—'

'চীয়ার্স!'

আগুন তরল হয় না। তবু জ্বালা ছড়িয়ে নেমে যেতে পারে, গলা বেয়ে, বুকের আশেপাশে, শাখা-প্রশাখায় বিদ্যুতের মতো। চাইলে সে ক্ষমাহীন হতে পারে—যে-ভাবে হয়ে এসেছে এতোকাল, প্রায়ই, কারুর তোয়াক্কা না ক'রে। সবটাই নিজেকে তৃপ্ত করার জন্যে। কানাকানির হাওয়ায় কখনো কি শোনেনি সেই সম্বোধন: ব্লাডি বাস্টার্ড! অসহায় সে-সব মুহূর্তের অস্বস্তি কি অতো সহজে মিটে যায়! ক্ষমতার অপব্যবহার! অর্জনের জন্যে যাকে সহ্য করতে হয়েছে ক্লেশ আর অপমান, একটু-আধটু অপব্যবহারে কী আর এমন চিড় ধরবে তার চরিত্রে!

পুরো হাতে খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল দীপ্ত।

'গুড্ নাইট এভ্রিবডি। আই অ্যাম অফ্।' নতুন চারার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে-থাকা সুনীতার পিঠে হাত রাখল দীপ্ত, 'চলো সুনীতা—'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল সমীরণের মুখ।

'তুমি চ'লে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু দাঁড়াও। আমিও আসছি—'

সুনীতা এগিয়ে গেছে। দূরে ছড়িয়ে আর যারা আছে, এই মুহূর্তে তারা চ'লে গেল আরো দূরে, দর্শকের ভূমিকায়। দৃশ্যটা চেনা ; অন্তত মিস্টার রে'র প্রমোশন হওয়ার পর থেকে নতুন কিছু নয়। পরস্পরেব দিকে তাকিয়ে হেসে নিল রবি আর বিমল। এখন চলবে।

'আর একটা গাড়ি আছে। ওদের নিয়ে তুমি চ'লে যেও।'

'অর্ডার করছ ?'

'ওয়েল···আমি বোধহয় করতে পারি—'

'ঠিক আছে।' ঠোঁটে দাঁত বসাল সমীরণ, 'একদিন আমাকে না হ'লে চলত না !'

'হোয়াট ডু ইউ মীন্ !'

সম্ভবত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সুনীতা। ওকে আবার এদিকে আসতে দেখে চুপ ক'রে গেল সমীরণ। থমথমে মুখ। কিছু বলবে না ভেবেও বলল, 'গুড নাইট।'

সৌজন্যহীন, অনিচ্ছা থেকে উচ্চারিত হলো শব্দগুলি। অভ্যাসেও হতে পারে। এমনও হতে পারে, তাৎক্ষণিক আবেগ চাপা দেওয়ার জন্যে অন্য কোনো শব্দ খুঁজে পায়নি সমীরণ—হয়তো সে বাস্টার্ড্-ই বলতে চেয়েছিল। না-পারার রোষ থেকে এখন এগিয়ে যাবে ঢের দূর ; ক্ষোভ থেকে ঘৃণার দিকে। কান্ট্ বি হেল্প্ড্! মনে মনে হাসল দীপ্ত। সমীরণ কি বুঝবে, অপমান করতে ভালোই লাগে তার !

দ্রুত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে এলিভেটর। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান হাতখানেকও নয়। এতো কম দূরত্বে দাঁড়িয়েও জড়োসড়ো হওয়ার চেষ্টা করছে সুনীতা, তবু আড়াল করতে পারেনি শরীরের গন্ধ। ও-টিতে শুয়ে অ্যানাসথেসিয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মতো অন্ধকার একটা অনুভূতি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রমশ এগোচ্ছে শিরার ভিতর; সাত থেকে পাঁচে পৌছুতে পৌছুতেই মুখ ভ'রে উঠল এলাচ চিবুনোর স্বাদে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সুনীতার দিকে অল্প ঘেঁষে এলো দীপ্ত।

'ধরো, যদি হঠাৎ লোড-শেডিং হয়?'

সরবার জায়গা নেই। সেটা শোভনও নয়। আঁচলটা ব্লাউজের ফাঁকে গুঁজে নিয়ে সুনীতা বলল, 'হঠাৎ তা হবে কেন!'

'যদি হয়! কী করবে?'

'জানি না।' অপ্রস্তুতভাবে হাসল সুনীতা, 'আপনি কী করবেন?'

'আমি! গেস?'

'কী ক'রে বলব!'

স্টপ-স্যুইচে হাত দিল দীপ্ত। একটা ঝাঁকুনি। আশঙ্কায় দেয়াল আঁকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা করল সুনীতা।

'আই'ড প্রেফার টু চেঞ্জ মাই ওয়াইফ্।'

পাঁচ-বাই-চারের নিখুঁত আয়তনে আবদ্ধ এলিভেটরের মধ্যে দীপ্তর চোখ থেকে রক্ত-মাংস লুকিয়ে রাখার জন্যে আঁচলের আড়ালও যথেষ্ট নয়। কলকল শব্দ উঠল পেটে। তবু খুশী করার গলায় সুনীতা বলল, 'তার মানে?'

'মানে?' সামনে লাল আলোর সঙ্কেত। হয়তো ডাকছে কেউ। হয়তো সমীরণ। যা বলার এখনই বলতে হবে। ব্যস্ত আঙুলে গ্রাউণ্ড-স্যুইচে চাপ দিল দীপ্ত।

'ইন ফেভার অফ দি ডার্কনেস···ইন ফেভার অফ ইওর ডার্ক লিপ্স্···'

সুনীতা কাঁপল। দরজা খোলার আগেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল,

দীপ্ত ওর হাত চেপে ধরল।

'তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। লেট ইট ওপেন!'

'খুব দেরী হয়ে গেল!'

'কোথায়!' বেরুতে বেরুতে কব্জি তুলল দীপ্ত, 'একটা বাজেনি এখনো! বেশী দূরে তো নয়—মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

দীপ্তকে আগে বেরুনোর সুযোগ দিল সুনীতা। অসম্ভব ভারী লাগছে পা দুটো, কোমর জুড়ে আড়ষ্টতা, অদৃশ্য পিঁপড়েরা হেঁটে যাচ্ছে নাভিমূল ছুঁয়ে। যদি সে-রকম কিছু ঘটে, সে কি প্রতিবাদ করবে? সুনীতা ভাবল। দীপ্ত বিবাহিত, না হ'লে এতোটা দ্বিধাগ্রস্ত হতো না।

নিজে উঠে সুনীতাকে ডেকে নিল দীপ্ত। স্টার্ট দিল্ গাড়িতে।

শব্দগুলো অনুরণন তুলছে কানেঃ 'ইন ফেভার অফ দি ডার্কনেস...', সেই মুহূর্তের চাতুর্য ভেদ ক'রে ফুটে উঠছে অন্য তাৎপর্য—এলিভেটরের শব্দহীন ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃত হতে চাইছে আরো বেশী নৈঃশব্দ্যে—এক প্রায়-গ্রাম্য ডাক্তারের সরল শিশুর সঙ্গে সাড়ে তিন হাজারের ছাপ-মারা দীপ্ত রায়ের নিরন্তর পারাপার ছাড়া যেখানে আর কোনো বিনিময় হয় না।

একটু আগে সুনীতার শরীরে নিজেব আধিপত্য বিস্তারের কথা ভেবেছিল দীপ্ত—আরোপিত কলঙ্কে স্থাপন করতে চেয়েছিল সামান্য সত্য। সুনীতা কি অনুভব করেছে তার উদ্দেশ্য! সম্ভবত করেছে। না হ'লে আঁচল দিয়ে গভীর স্তনের ভঙ্গি আড়াল করার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের অসহায়তাও লুকোতে পারত। ভীরু মেয়েটি! জানে না তাৎক্ষণিক অন্ধকারের সম্ভাবনার থেকেও আরো ব্যাপক সম্ভাবনা অপেক্ষা ক'রে আছে তার জন্যে—যেখানে শরীরে লিপ্ত না হয়েও দীপ্ত পেয়ে যেতে পারে তার চেয়েও বড়ো স্বাদ!

ফাঁকা রাস্তা। একটা দুটো গাড়ি কখনো একগতি, কখনো বা ছুটে যাচ্ছে পরস্পরের বিপরীত দিকে। অফিস থেকে বেরুবার সময়েই একবার আকাশ দেখেছিল দীপ্ত। খুব কালো; হাওয়ায়

থম; রাতের শূন্যতা জুড়ে আর্দ্র আবহ। দূরে কাছে হয়তো বৃষ্টি হয়ে গেছে কোথাও—পিচের মসৃণতায় তার আভাস, হয়তো হবে আবার। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে একদমে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলো দীপ্ত। সুনীতাকে বলেছিল পনেরো মিনিট। সময় আছে, অতোটা ব্যস্ত না হলেও চলে।

পাশে সুনীতা। স্টুডিয়োয় ছবি তোলার ভঙ্গিতে কাঠ হয়ে তাকিয়ে আছে সামনে। মেয়েটি অ্যাম্‌বিসাস, কিন্তু ভীতু—অসম্ভব ভীতু! এলিভেটরের কল্পিত দুঃস্বপ্ন থেকে বেরুতে পারেনি এখনো—যৌবন ও বুদ্ধি নিয়ে আটকে পড়েছে শরীরে। সন্দেহ যায় নি। এই মেয়ে ফেস্‌ করবে সিন্‌হাকে! ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই পাখির বাসার মতো ঝ'রে পড়বে না তো!

চিন্তাটা এলোমেলো ক'রে দিল তাকে। স্টীয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে সিগারেট ধরাল, যেন একটা অবলম্বন দরকার ছিল। সুনীতাকে বলা যায়, যে-কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে অস্বস্তির মধ্যেও তুমি মেনে নিচ্ছ আমাকে, ভাবছ কফি-একাউন্ট তোমার মতো একজন জুনিয়রের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভবিষ্যৎ সহজ ক'রে দিলাম তোমার জন্যে—সে আমার দান নয়। আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি মাত্র—বঁড়শির চারের মতো; তুমি যোগ্য ব'লে নয়, শুধু সিন্‌হা তোমাকে চেয়েছিল ব'লে! বলবে কি, স্বার্থের জন্যে নিজের স্ত্রীকেও যে ঠেলে দিতে পারে অস্বস্তিতে, নিঃসম্পর্কিতা একটি মেয়ের জন্যে তার প্রাণে দয়া থাকতে পারে না! সত্য সামনে, ভেবে ছাখো কী করবে তুমি!

মেরুদণ্ড টান ক'রে বসল দীপ্ত। বুক দিয়ে নামিয়ে দিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অন্যমনস্কতায় শ্লথ হয়ে পড়েছিল গতি, আবার দ্রুত ক'রে তুলল। ঠিক হোক বা ভুল, ডিসিসন একবার নেওয়ার পর আর তা প্রত্যাহার করা যায় না। সুনীতাকে বাঁচানোর দায়িত্ব সুনীতারই, তার নয়। সমীরণকে পিছনে ফেলে এসেছে সে, আরো অনেককে; বাঁচার জন্যে, প্রয়োজন হ'লে, সুনীতাকেও ফেলবে। আই মাস্ট সারভাইভ, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ভাবল দীপ্ত;

যুক্তি দিয়ে—তুলনা টেনে এনে। তবু সহজ হ'তে পারল না। সম্ভবত মেয়েটি তাকে টানছে, ভীরুতা দিয়ে রুদ্ধ করতে চাইছে তার গতি! ইম্‌পসিব্‌ল্‌!

ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সামনের দৃশ্য। হাল্‌কা, শব্দহীন বৃষ্টি কখন শুরু হয়েছে খেয়াল করেনি। ওয়াইপারটা চালু ক'রে দিল দীপ্ত। আচ্ছন্ন আলোয় দেখা ভিটামিনের হোর্ডিংয়ে উপছে পড়ছে স্বাস্থ্য। কাছাকাছি ফুটপাথ ঘেষে কালো অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে—খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফুটপাথে দাঁড়ান মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে একটি লোক। চকিতে ঘাড় থেকে আঁচল ফেলে দিয়ে আবার তুলে নিল মেয়েটি, পেরিয়ে যেতে-যেতে দীপ্ত তার মুখের চড়া প্রসাধন লক্ষ করল। ফর সেল! আর একটু পরেই, সুনীতা যতোক্ষণে বাড়ি পৌঁছুবে, দীপ্ত জানে, মুছে যাবে এই দৃশ্য। ওয়াইপার সক্রিয় আছে—দৃষ্টি সামনে, সুনীতা কি দেখছে না কিছু!

'সুনীতা?'

'উঁ—'

'এতো চুপচাপ কেন?'

'এমনি—'

'ঘুম পাচ্ছে?'

সুনীতা তাকাল, শুধু এটুকু বোঝাবার জন্যে যে সে ঘুমিয়ে পড়েনি। চেষ্টা ক'রে হাসল।

সিগারেটটা রাস্তার শূন্যে ছুঁড়ে দিল দীপ্ত। এক হাতে স্টীয়ারিং ধ'রে অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সুনীতার দিকে।

'কাছে এসো।'

আদেশের মতো শোনাল কথাটা। ইণ্টারনাল কম্যুনিকেসনের মধ্যে দিয়ে এই কণ্ঠ সে শুনে আসছে বহুদিন, এখন জবাবদিহি করতে হবে। কিছু বলার আগে একবার পিছনে তাকাল সুনীতা, একবার বাইরে। যেন কিছু হারিয়ে গেছে! দীপ্ত সুযোগ দিল না। হাত ধ'রে টানতেই গায়ের ওপর এসে পড়ল সুনীতা। তীব্র হেডলাইট জ্বেলে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি।

বিশ্বস্ত হাতে পাশ কাটিয়ে গেল দীপ্ত।

'এ-বছর কতো ইনক্রিমেণ্ট আশা করো ?'

খেলাচ্ছলে কথাটা বলবার চেষ্টা করল দীপ্ত, ব'লে খুশী হলো। স্ট্রেট ডীল। যতোই প্রতারণা থাক, মেয়েটি ভাববে, দ্বিধায় পড়বে, পিছুবার আগে এগিয়ে আসবে একটু।

সুনীতা জবাব দিল না, ভঙ্গিতে পরিবর্তন হলো না কোনো। মুখ ঘুরিয়ে ওর কপাল ও চুলের গন্ধ নিল দীপ্ত, আর-একটু কাছে টানল। মুখে আবার সেই এলাচের স্বাদ। কিন্তু, সে সিন্‌হা নয়, সমীরণ নয়, মুস্তাফী নয়। ভাবা মাত্র এড়িয়ে যাওয়া কী আর এমন শক্ত তার কাছে! এলিভেটরের একান্তে অন্ধকার সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছেছিল সুনীতা, অন্ধকার ভ্যাখেনি। সেই অন্ধকার এখন তার সামনে। সুনীতা দেখুক।

মাংসহীন আঙুলে ওর কাঁধে চাপ দিল দীপ্ত।

'ডোণ্ট বি অ্যাফ্রেড। আমি খুব খারাপ লোক নই!'

'আমি কিছু বলিনি···'

'কিন্তু···', হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে হাসল দীপ্ত, 'ভয় তো পেয়েছিলে!'

'না—'

'ইউ আর এ মিস্‌ফিট্!' হঠাৎ অন্য কথায় চ'লে গেল দীপ্ত, 'এনিওয়ে, তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করো নি!'

সুনীতা সাড়া দিল না। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে, তবু সরে বসার কথা ভাবল না। এতোক্ষণে সত্যিই বিমূঢ় বোধ করল সে, একটু বা বিধ্বস্ত। কী চেয়েছিল দীপ্ত? প্রশ্রয়? নাকি একা পেয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে নিল!

'কাল প্রেজেন্‌টেসন।' বাড়ির সামনে সুনীতাকে নামিয়ে দিয়ে দীপ্ত বলল, 'স্লীপ ওয়েল। গুড নাইট্।'

মাপা কথা। অস্ফুটে উচ্চারণ করল সুনীতা, 'গুড নাইট্।'

আর পিছনে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না দীপ্ত। সুনীতা ছিল, এখন নেই—থাকাটা না-থাকার সঙ্গে মিশে গেছে চমৎকার।

অনুভূতি এক্স-রে করলে পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলির কোনো চিহ্নই ধরা পড়বে না এখন। পরিবর্তে উঠে আসবে অন্যতর, বিষণ্ন ক্ষতগুলি। মুখ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে কষা রক্ত—প্রতিটি স্মৃতির ওপর সৃষ্টি করছে পিচ্ছিল আবরণ। এই রাতে, অনুগত রাস্তার ওপর দিয়ে একলক্ষ্যে বাড়ির দিকে ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ মূহ্যমান বোধ করল দীপ্ত। কী হয় যদি এই মুহূর্তে স্পীডোমিটারের কাঁটা ছাড়িয়ে যায় একশো'র দাগ, শরীরের যাবতীয় শক্তি জড়ো ক'রে নিজেকে আক্রমণ করে সে! সাংঘাতিক মজা হবে না কি! যদি সে-রকম হয়, কাল ভোর তাকে আবিষ্কার করবে থ্যাঁতা মাংসপিণ্ডের ভিতর, এক নিরীহ গ্রাম্যতায়, নিরপেক্ষ আমোদে গড়া শৈশবে। আশ্চর্য, কতো সহজে নেমে আসা যায় সাড়ে তিন হাজারের দুঃস্বপ্ন থেকে, আলীপুরের ফ্ল্যাটের প্রশস্ত দূরত্ব থেকে স্বপ্নহীন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে!

লিফ্‌ট্‌ চলছে। তবু গাড়ি তুলে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগুলো দীপ্ত; গুনে গুনে উঠতে লাগল। জয়িতা কি অপেক্ষা করছে এখনো? হয়তো। সে কি বোঝে, ভালোবাসা থেকে কবে যেন অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তার স্বামী নামে পরিচিত এই লোকটি—মুঠোভর্তি আফিম-মাখানো মাংসের টুকরো, আত্মরক্ষার জন্যে যান্ত্রিক হাতে ক্রমাগত ছুঁড়ে দিচ্ছে সংসারের দিকে!

ক্লান্তি আজ একটু বেশীই লাগছে। কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসেছে দীপ্তকে। এতো রাতে জয়িতা বিরক্ত হবে জেনেও কলিং বেলে ঘন ঘন চাপ দিতে লাগল। আসলাম কোয়ার্টার্সে, আয়াও বেরুবে না। সুতরাং জয়িতা। কাল কী হবে ঠিক নেই, ইতিমধ্যে খানিকটা হেসে নেওয়া যাক।

দরজা জয়িতাই খুলল।

'হোয়াট হ্যাপেণ্ড, আর ইউ ড্রাঙ্ক?'

দীপ্ত হাসল। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে—?'

জয়িতা জবাব দিল না। বেডরুমে আলো জ্বলছে। গম্ভীর

মুখে পাপুর ঘরের পর্দাটা টেনে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দীপ্ত সোফায়, জুতো খুলতে ব্যস্ত।

'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?'

জেরা করার ধরনে জিজ্ঞেস করল জয়িতা, কিছু বা রুক্ষ গলায়। দীপ্ত অবাক না হয়ে পারল না।

'কেন! ডিড্‌ন্ট্ ইউ নো?'

'বলবে তো অফিসে? ইউ ড্যাম লায়ার! রাতটা কাটিয়ে এলেই তো পারতে!'

ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়। যেন ভিতরের রাগ, জ্বালা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে আরো। গালের ওপর নীল শিরাটা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। স্থির চোখে ক' মুহূর্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকল দীপ্ত। নিজেও তৈরি হলো।

'কী হয়েছে!'

'কী হয়েছে!' বলার আগে নিঃশ্বাস নিল জয়িতা, 'এক ঘণ্টা আগে অফিস থেকে বেরিয়েছ তুমি—উইথ সুনীতা! দিস ইজ ইওর ক্যাম্পেন! ব্লাফ্—অল ব্লাফ্!'

'আই সী!' সন্দেহে ভুরু কোঁচকাল দীপ্ত, ঘা-টা সহ্য ক'রে নিল।

'কে বলেছে! সমীরণ?'

'যেই বলুক! বলো, মিথ্যে বলেছে!'

জয়িতা দাঁড়াল না। প্রায় ছুটে চ'লে গেল ঘরের ভিতর।

ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারল না দীপ্ত। ঘরের পর্দাটা আটকে গেল চোখে। দেরি দেখে জয়িতা কি আবার ফোন করেছিল অফিসে? ব্যাপারটা অভাবিত; বিরক্তিতে মোজা দুটো দূরে ছুঁড়ে দিয়ে ভাবল, সম্ভবত সমীরণই বলেছে, না হ'লে জয়িতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অফিস ছেড়ে সমীরণ কি এখন ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে! ঠিক আছে, সমীরণ, ইউ আর ওয়েলকাম!

সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল দীপ্তর ঠোঁটে। সার্টের বোতাম খুলতে

খুলতে চোখ পড়ল হাতায়—কালো, লম্বা একটা চুল জড়িয়ে আছে সেখানে। খুব সাবধানে সেটা তুলে মেঝেয় উড়িয়ে দিল দীপ্ত। জয়িতা দ্যাখেনি—শোনা কথাতেই জ্বলে যাচ্ছে ঈর্ষায়! এই ভালো। যতোক্ষণ ঈর্ষা আছে অন্তত ততোক্ষণ জয়িতাও থাকবে।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বুকের বাঁ-দিকে চেপে ধরল দীপ্ত; ছুঁচ-ফোটানো থেকে একটা বড়ো যন্ত্রণা জায়গা ক'রে নিচ্ছে ক্রমশ। কিছু হলো নাকি! তারপর, আস্তে আস্তে ব'সে পড়ল সোফায়।

যন্ত্রণাটা সরে যাচ্ছে; জলে জল আসার মতো আস্তে আস্তে ফিরে আসছে আত্মবিশ্বাস। আলোর ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার—ওরই মধ্যে রহস্যময় দৃঢ়তা নিয়ে ফুটে উঠল প্রফেসানাল মুখগুলি। প্রতিপক্ষকে চিনে নিতে কখনো ভুল করে না দীপ্ত রায়, এখনই বা করবে কেন!

একতাল নরম মাংসের মতো অভিমান নিয়ে জয়িতা এখন মুখ গুঁজেছে বালিশে। তার কথা এখন না ভাবলেও চলে।

ই-সি-জি রিপোর্টে পাওয়া গেল না কিছু। প্রেসারে তারতম্য ঘটেছিল সামান্য; এখন নর্মাল।

'ভয় পাবার কিছু নেই', ডাক্তার বললেন, 'দিন পনেরো রেস্ট নিন, সেরে যাবে।'

থামলেন একটু। পরের কথাটা জয়িতার সামনে বলা যায় কিনা ভাবলেন।

'ড্রিঙ্ক কি খুব বেশী করেন?'

'বেশী কি না জানি না।' দীপ্ত বলল, 'তবে করি—'

'করি মানে। পিপে পিপে!' হাতেমুখে একটা ভঙ্গি করল জয়িতা, 'ওর ওপরেই তো আছে! রোজ লাঞ্চ পর্যন্ত করে না!'

দীপ্ত প্রতিবাদ করল না। এটা জয়িতার এলাকা। গত তিন চারদিনে সমস্ত কর্তৃত্ব সে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে; এমনভাবে, যাতে আর কেউ ঘেঁষতে না পারে। প্রথম দিনে ডাক্তারের নির্দেশে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল দীপ্ত। একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমের পর মনে হচ্ছিল একটা দূরত্ব পেরিয়ে এলো—বেশ ঝরঝরে লাগছে, কোনো ক্লান্তি নেই শরীরে। দৈনন্দিনতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেওয়ার যুক্তি ছিল না কোনো। জয়িতাই সরিয়ে রাখল। সে নিজে কিছুটা নিঃশঙ্ক হলেও জয়িতার ভয় যায়নি। আকণ্ঠ উদ্বেগের মধ্যেও এ ক'দিন প্রাণপণে জিইয়ে রেখেছিল নিজেকে। ডাক্তারের আশ্বাসে আবার ফিরে এলো স্বরূপে, অন্তত কথা শুনে তাই মনে হবে।

ডাক্তার বললেন, 'বুঝেছি। ওটা অবশ্য ওঁর একার রোগ নয়; এ-রকম আরো দু'একটি পেসেন্ট আমার আছে। তবে, একেবারে ছাড়তে না পারুন, কন্ট্রোল করুন। ড্রিঙ্ক, স্মোকিং দুটোই। টেনসনের চাকরি, এগুলো হার্ম্ করে—'

পরামর্শটা নতুন নয়। এর আগেও বলেছে অনেকে, অনেক-ভাবে। খুব গা করেনি দীপ্ত। স্বাস্থ্যে জোর থাকলেও মাঝে মাঝে যখন শুকিয়ে আসে শরীর, সে নিজেও কি বোঝে না, বাহ্যিক নেশা তাকে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষতির দিকে! এই সেদিনও, বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার আগে, শরীর জুড়ে টের পেয়েছিল অস্বস্তি, শুকিয়ে এসেছিল ঠোঁট, জিব, হাতের তালু। দুর্ভাবনায় টান পড়েছিল রক্তে। এ-সবই হয়েছিল হঠাৎ, মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে—প্রবল জ্বরে যেমন হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সবই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে, তেমনি, নিজের যতো কাছে সম্ভব শরীরটাকে টেনে এনেছিল দীপ্ত। শরীরের প্রতি এতোখানি মমতা এর আগে কখনো বোধ করেনি। রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না পুরোপুরি। এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

একা নয়। জয়িতাও। বোধহয় প্রতিজ্ঞা করেছিল দীপ্ত একেবারে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে নড়বে না—ডাক্তার নির্ভয় ক'রে যাওয়ার পর আর দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকার মানে হয় না কোনো। এখন হেসেখেলে পুরনো হয়ে যেতে পারে আবার, জয়িতা ভাবল, কিন্তু তার আগে দীপ্তকে আরো ক'টা দিন ছুটি নিতে বাধ্য করা দরকার। ক্লিনিক্যাল রিপোর্টেই যদি সবকিছু ঠিক-ঠিক ধরা পড়ত, তাহ'লে শরীর নিয়ে এতো জটিলতা বাড়ত না। কিছু না হলেও নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছিল দীপ্তর, হয়তো সামান্য ক্ষণের জন্যে—এমনও হতে পারে, স্বাস্থ্যের জোরে ভালোমন্দ কিছু পাকাপাকিভাবে হওয়ার আগেই কমে গিয়েছিল আক্রমণের তীব্রতা। একসঙ্গে অনেকদিন থাকা হলো, মুখের অভিব্যক্তি দেখে এখনো দীপ্তকে না-চেনার মতো বোকা নয় জয়িতা। সাবধান তাকে হতেই হবে।

দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে এলো জয়িতা। দীপ্ত ব্যালকনিতে। পাশে পাপু। আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে প্লেন, সেদিকে আঙুল তুলে কী বলছে বাবাকে। ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটানা শব্দ এগিয়ে যাচ্ছে লাইন ধ'রে, হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেলেও

রেশ কাটছে না তার। ইচ্ছে করেই মুখ ভার রেখে ঘরের মধ্যে থেকে গেল জয়িতা। নতুন প্রেসক্রিপসন লেখার জন্যে প্যাড আর কলম বের ক'রে দিয়েছিল ডাক্তারকে, সেগুলো তুলে রাখল জায়গামতো, ডাক্তারের ফেলে-যাওয়া সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ফেলে এলো বাস্কেটে। এখন, অগত্যা, বিছানার চাদর নিয়েই টানাটানি করবে সে, কিংবা, বেরুবার আগে, এই ফাঁকে চুলটাও আঁচড়ে নিতে পারে।

ঘর আর ব্যালকনির মাঝখানে ফিনফিনে পর্দার ভিতর দিয়ে দু'জনকে প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। রেলিংয়ে ঝুঁকে পাপু এখন আকাশ থেকে রাস্তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে দীপ্তকে। আজ সে স্কুলে যায় নি, জোর করেও পাঠানো যায় নি। বহুদিন পরে দীপ্ত আজ ক'দিন পুরোটা সময় বাড়িতে—স্যুট, ট্রাউজার্স, বুশসার্টের তৎপরতা নেই, এমনকি সিগারেটের ধোঁয়ায় মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে না মুখ। এ-দৃশ্য পাপুর কাছে নতুন। হয়তো, হয়তো কেন—নিশ্চয়ই, পাপুর চোখে একটা ছবি আছে তার বাবার, দীপ্তর আজকের রূপান্তরের সঙ্গে যা হুবহু মিলে যায়। ছবিটা সে আর হারাতে চায় না। অল্প ঘোরের মধ্যে জয়িতা ভাবল, দৃশ্যটা তার কাছেও কি নতুন নয়!

প্লেনের শব্দ কখন মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। পিছনে পড়ে আছে দীর্ঘ সরলরেখা—একাভিমুখী ভাবনা থেকে চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে ফেরাতে পারল না জয়িতা।

কেরিয়ারিস্ট বলতে যা বোঝায় দীপ্ত ঠিক তাই, তার চেয়ে এক চুল কম নয়, বেশী নয়। পা ফেলার আগে পরখ ক'রে নেয় পায়ের চেটো—দম আছে ঢের, দৌড় শুরু ক'রে মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়েনি কখনো। দৌড়ুচ্ছে এখনো। দূরপাল্লার দৌড়ের মতো ট্র্যাকের শুরুটা চোখে পড়লেও শেষটা যেন ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে। অগ্রবর্তী প্রতিটি বিন্দু থেকে দূরত্ব তাই সমানই লাগে। এতোটুকু রোখ কমেনি তবু। দীপ্তর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও দৌড়ে এসেছে বহুদূর। ঠিক কতোদূর, পিছনে তাকিয়েও এখন আর

তা অনুমানে কুলোয় না। তবে নিশ্চিত অনেক দূর। খুব চেষ্টা করলে কুয়াশায় ঘেরা থামের মতো আবছাভাবে শুরুর খুঁটিটাও চোখে পড়ে কখনে সখনো, প্রায়ই পড়ে না। তবু আজ, এই মুহূর্তে, দীপ্তর অগোচরে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক আবেশে ভ'রে উঠল জয়িতা। এই সেই লোক, যে তাকে জয় করার আগেই দাবী করেছিল ; এই সেই লোক, যে আলাপের তৃতীয় দিনেই শুতে চেয়েছিল তার সঙ্গে—এই সেই লোক, যার প্রতি ঘৃণায় একদিন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল তার ! পারেনি, ঘৃণা থেকেই ছুটে গিয়েছিল আকর্ষণের দিকে—শরীরী আকর্ষণে, একটি নষ্ট ভ্রূণের জন্ম দিতে। ভালোবাসা এসেছিল পরে। নেতিয়ে-পড়া ডাল থেকে যেভাবে জন্ম নেয় সবুজ, ঠিক সেইভাবে—আস্তে আস্তে নিজের রক্তে পাপুর জন্ম টের পেয়েছিল জয়িতা, টের পেয়েছিল দীপ্তর স্থায়িত্ব। সেদিনের অনুভূতি হঠাৎ স্পর্শ ক'রে গেল তাকে।

খুব মমতাভরে ছেলের নাম ধ'রে ডাকল জয়িতা, 'পাপু, ও পাপু—'

পাপু ঘরে এলো। সঙ্গে দীপ্তও। বোতাম-খোলা পাঞ্জাবিতে আলস্য জড়ানো। ব্রাশ না-করা চুলগুলো ঝুঁকে এসেছে কপালে, গালে দাড়ির আভাস। ঠিক রবিবারেরও নয়, বিশুদ্ধ ছুটির চেহারা। জয়িতা মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাবলে অবাক লাগে, ক'দিন আগে এক রাতে এই লোকটির দিকে তাকিয়েই 'গেট আউট' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে !

গায়ে গায়ে এসে আঁচল টেনে ধরল পাপু। ডাক্তার আসবে ব'লে আজ ভোরেই জয়িতা নাইটি ছেড়েছিল।

'কী, মা !'

'তুমি বাবার কাছে থাকো। আমি একটু বেরুবো।'

'ও মা, বাবাও তো অফিসে যাবে বলল।'

'না, যাবে না—', পরোক্ষে প্রস্তুতি চালালো জয়িতা, আলগোছে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে আবার ফিরে এলো পাপুতে, 'কী, থাকবে তো ?'

'বাবা, থাকবে ?'

দীপ্ত হাসল ; জবাব দেওয়ার আগে স্ত্রীকে লক্ষ করল একটু। মনে হচ্ছে হঠাৎই আড়াল তুলে দিয়েছে জয়িতা—একটু আগে, ডাক্তারের সামনে, যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল, এখন আর তা নেই। 'পিপে পিপে' কথাটা জয়িতার মুখে আজই নতুন শুনল দীপ্ত ; জয়িতার পক্ষে অসচরাচর বলেই তখন মজা পেয়েছিল খুব। এ-সব শুনে মনে হয় জয়িতারও একটা শৈশব ছিল—এখনো তা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় কাঁচা শব্দের ব্যবহারে, ভুলতে পারে না। দীপ্তও কি পেরেছে!

'শুনলে তো ?'

'কী ?'

'ডাক্তার কী বলল!' কথাটায় জোর দেওয়ার চেষ্টা করল দীপ্ত, 'আই টোল্ড্ ইউ! নাথিং রং।'

'সেটা তোমাকে বলেছে—', ব'লে, সামলে নিল জয়িতা। অযথা ভয় পাইয়ে লাভ নেই। থেমে বলল, 'এখন সাতদিন অন্তত বাড়িতে ব'সে থাকো।'

'বাড়িতে ব'সে থাকলে কি আমার চলবে! এখনই ক্লামজি লাগছে—'

'ঠিক আছে,' প্রসঙ্গটা শেষ করার চেষ্টায় জয়িতা বলল, 'নিজে যা ভালো বোঝো করো। সবই যদি নিজের ইচ্ছেয় করবে, তাহ'লে শুধু শুধু ডাক্তাব ডাকা কেন!'

দু'জনের কথার মাঝখানে এবার এগিয়ে এলো পাপু। বায়না করার গলায় বলল, 'থাকো না বাবা বাড়িতে!'

'ও. কে, ও. কে।' মাটিতে পা রেখে বিছানায় ব'সে ছিল দীপ্ত, পা দুটো বাড়িয়ে সাঁড়াশির ধরনে কাছে টেনে আনল পাপুকে। মাথাভর্তি চুল পাপুর, মুখের গড়নে জয়িতার আদল। মুঠোয় ওর একমাথা চুল টেনে ধ'রে দীপ্ত বলল, 'তাহ'লে তুমি আর আমি থাকি। মাকে ঘুরে আসতে বলো—'

'বাব্বা, এতো টান ছেলের জন্যে! জানতুম না তো!'

জয়িতা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ইতিমধ্যে ওয়াড্রোব খুলে শাড়ি বের করেছিল—লালপেড়ে ঘি রঙের শাড়ি, জয়িতার পছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা চোখে পড়লেও দীপ্ত কিছু বলেনি তখন। ড্রেসিং রুমের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে লাল-সাদার মিশ্র আবরণ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল তাকে। আগাগোড়া সচেতন থাকা সত্ত্বেও কখন কীভাবে বদলে যাচ্ছে রঙগুলি, ধরতে পারছে না ঠিক-ঠিক। টান ক'রে বাঁধা স্নায়ুগুলো বিশ্রামের আবহে ছড়িয়ে যেতেই অসংলগ্ন লাগছে সবকিছু—রঙ, শব্দ, কথা। যেন প্রত্যক্ষের আড়ালে থেকে যাচ্ছে আরো কোনো অর্থ। বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস দিয়ে তাদের স্পর্শ করা সম্ভব নয়।

নিজেকে ঢিলে ক'রে নিল দীপ্ত। খুব হাল্কা গলায় যে-কথাটি ব'লে এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জয়িতা, এখন তারও একটা মানে ক'রে নিল। এই মুহূর্তে নয়; ঠিক এই কথাগুলি বলার জন্যে জয়িতা যেন অনেকদিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিল মনে মনে। সুযোগ পায় নি। ভাবেনি অভ্যাস থেকে সত্যিই কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবে দীপ্ত। আজ সে নিজেই সুযোগ ক'রে দিয়েছে!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে দীপ্ত। কর্মহীন, ক্লান্ত দিনযাপনে অসম্ভব নির্বান্ধব মনে হয় নিজেকে। এতোদিন ধ'রে যে-সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়েছে সবার ওপরে, যেন নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই তাদের—লতানে গাছের মতো খুঁটি ছাড়া উঠতে পারে না আকাশে। জীবিকা থেকে দূরে, আলস্যে, কাণ্ড-শুকনো ডালপালা নিয়ে নেতিয়ে পড়ে দীপ্ত। বাড়িতে টেলিফোন আছে, তবু খুঁজে পায় না এমন কোনো সম্পর্ক, যেখানে ডায়াল ক'রে বলতে পারে—দীপ্ত বলছি। নাম ভাবতে মনে পড়ছে সমীরণ, সিন্‌হা, মুস্তাফী, রবি, বিমল, যোশী, সুনীতা—জীবিকার সুতোয় জড়ানো সব নাম, একটিকে টানলেই এসে পড়ে আর-একটি, তারতম্যহীন স্লাইডের মতো। কেউই ব্যক্তিগত নয়। কবরখানার ফলকে নাম পড়ার ধরনে একে-একে তাদের পেরিয়ে যায় দীপ্ত,

দাঁড়ায় না—আকস্মিক চিন্তায় খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। ভয় হয় ; একদিন হয়তো সে নিজেকেও পেরিয়ে যাবে এইভাবে।

রাতভোর বৃষ্টি গেছে কাল। এই বিছানায়, জয়িতার শরীরের প্রাকৃতিক গন্ধের ভিতরে শুয়ে, সারা রাত কান পেতে রেখেছিল বৃষ্টির শব্দে। ঘুম আসেনি। এমন পরিচ্ছন্ন ঘুম না-হওয়ার কষ্ট অনেকদিন অনুভব করেনি দীপ্ত। শেষ তিন চারটে দিন মদ্যপান না করলেও ঘুমের বড়ি খেয়েছিল, ঘুমোতে অসুবিধে হয় নি কোনো। কাল রাতে ট্রায়াল দিয়েছিল—কাল রাতে টের পেল রাতগুলো দিনের চেয়ে অনেক বেশী দীর্ঘ, নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে বেজে উঠতে পারে শব্দ। একটানা অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রেখে শব্দের উৎসও জেনে গেছে কাল। সে-সব কিছুই মনে থাকেনি সকালে, বৃষ্টি থেমে যাবার পর। ছিমছাম রোদ্দুরে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে আবার রাতের অনুষঙ্গে ফিরে যেতে চাইল দীপ্ত। একটা, যা-হোক একটা অবলম্বন চাই। নিষেধ ভাঙবে নাকি একটু ? জয়িতা নেই, এখন ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে ফিরবে না। আসলামকে ডেকে বলবে নাকি ড্রিঙ্কস্ এনে দিতে !

না, পাপু আছে। নিজেকে সংযত ক'রে নিল দীপ্ত। চেয়ার টেবিলে ব'সে রঙ-পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকতে বসেছে পাপু, ইতিমধ্যে একটিও কথা বলেনি। 'বাবাকে বিরক্ত কোরো না', যাবার সময় ব'লে গেছে জয়িতা, হয়তো মনে রেখেছে কথাটা। কী দরকার ছিল জয়িতার এ-কথা বলার !

ঘাড় তুলে কনুইয়ে মাথা দিল দীপ্ত। পাশ ফিরল।

'পাপু ?'

একবার তাকিয়ে আবার ছবি আঁকায় মন দিল পাপু। সাড়া দিল না।

'কী আঁকছ ?'

'দেখবে ?' একটু বা সন্দেহের চোখে তাকাল পাপু। তারপর খাতা নিয়ে চ'লে এলো কাছে।

'বাঃ, বেশ তো!' প্রশ্রয়ের গলায় বলল দীপ্ত, 'এরা কারা?'

'চিনতে পারছ না! এটা মা, এটা তুমি—'

'আর তুমি কোথায়?'

'আমি!' অল্প দ্বিধা করল পাপু, 'আমি নেই!'

শব্দটা ঝুঁকে এলো কানে, রেশ মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই অনুরণন তুলল নৈঃশব্দ্যে। পাপুর জন্মের আগে জন্ম নিয়েছিল আর-এক পাপু, নামকরণের সুযোগ পায় নি দীপ্ত। বেঁচে থাকলে কী-রকম দেখতে হতো সে, অবিকল পাপুর মতো! ভ্রূণ কি কখনো উৎসের আদল পায়!

দীপ্ত বলল, 'দাও, আমি তোমার একটা ছবি এঁকে দিই—'

কলিং বেলটা কোঁ-কোঁ ক'রে উঠল এই সময়। কাগজের ওপর পাপুর আদল ফোটাতে ব্যস্ত দীপ্ত, চোখ তুলে বলল, 'দেখবে, কে এলো?'

'মা বোধহয়।'

'মা এখন আসবে না।' আসলাম আছে, তবু, দ্বিতীয়বার শব্দ হতেই দীপ্ত বলল, 'ত্যাখো না কে এলো!'

পাপু উঠে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলার শব্দে চমকে উঠল দীপ্ত। শম্পাদি!

আর ব'সে থাকা যায় না। বিশ্বাসও হয় না। অভ্যাসে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নিল দীপ্ত, পাঞ্জাবির ঝুল টানতে টানতে বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আরে, শম্পাদি! কী ব্যাপার!'

'তোর কী ব্যাপার বল আগে!' টেবিলের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আঁচলে চাপ দিয়ে মুখ মুছে নিল শম্পা, 'দিব্যি বাবু সেজে ব'সে আছিস বাড়িতে। এদিকে তোর অফিস বলল ভীষণ অসুস্থ, ফোন করাও নাকি বারণ!'

'ফোন করেছিলে?' অপ্রতিভভাবে বলল দীপ্ত, 'বোসো না?'

'বসছি। পরশু ফোন করেছিলাম—', বসতে বসতে বলল শম্পা, 'ওই লোকটা কে তোর, বেয়ারা না বাবুর্চি! একটু জল

খাওয়াতে বল আগে। কী রোদ বল আজ!'

রোদ শুধু বাইরে নয়, শম্পাদির সর্বাঙ্গে। ইশারায় আসলামকে জল আনতে বলল দীপ্ত। আড়ে তাকাল শম্পার দিকে। এখনো তেমনিই আছে, দশ কি বারো বছর আগে যেমন দেখে এসেছিল। বরং একটু রোগাই হয়েছে। চোখ সয়ে গেলে হয়তো পার্থক্যটা বুঝতে পারবে।

অল্প দূরে পাপু। চোখে পড়তেই শম্পা বলল, 'তোর ছেলে? কী লাভলি হয়েছে! এই যে, কাছে এসো।'

জড়োসড়ো ভাব কাটিয়ে দু'এক পা এগিয়ে এলো পাপু।

'নাম কি তোমার?'

'পাপু—'

'পাপু তো ডাক নাম, ভালো নাম বলো?'

'ভালো নামও পাপু।'

ছেলের স্বতঃস্ফূর্ততায় অবাক হলো দীপ্ত। শম্পাদি জাদু জানে। আজ ব'লে নয়, একদিন সেও বশীভূত হয়েছিল, এমনকি জয়িতার সঙ্গে মেলামেশা জমে ওঠার পরও ভুলতে পারে নি অনেক-দিন। এই সেদিনও 'ওল্ড ফ্লেম্' ব'লে ঠাট্টা করেছিল জয়িতা। দীপ্ত কি অস্বীকার করতে পারবে, আজও সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে পারছে না! শম্পার হঠাৎ-আবির্ভাবে খুশীই হয়েছে সে—অনেকক্ষণ একটানা গুমোটের পর হাওয়া এলো এক ঝলক; তবু না এলেই যেন আরো ভালো হতো!

ভিতরে একটা ক্ষরণ টের পেল দীপ্ত। ছবিগুলো ধুলো মাখা, বিবর্ণ, অপ্রয়োজনীয়ও। দীপ্তর কাছে তাদের কোনো দাবী নেই। তবু ফেলে দিতে পারেনি। পাপুর ঘরের আলমারিতে পুরনো ফাইলে বন্দী হয়ে আছে চিঠিগুলো—শম্পাদির, সুজনের, বাবা আর মা'র, অলিপ্তর, একটি বা দু'টি নির্মাল্যরও। মূল্যহীন, ভাঁজপড়া কয়েকটা কাগজ ছাড়া কিছু নয়। প্রতিবার বাড়ি বদলের সময় জয়িতা সেগুলো ফেলে দেওয়ার কথা তোলে। এবার একটু ক্ষিপ্তই হয়েছিল দীপ্ত, 'ওগুলো থাকায় কি অসুবিধে

হচ্ছে তোমার! এখন তো জায়গা অনেক বেশী!' চট ক'রে কোনো জবাব দিতে পারেনি জয়িতা। 'জঞ্জাল বাড়িয়ে লাভ কী!' পরে বলেছিল। জঞ্জাল!

পাশাপাশি দু'টি রাস্তা। দু'জন দীপ্ত। জয়িতার স্বামী, পাপুর বাবা, হিন্দুস্থান ফস্টারের নাম্বার টু-কে চেনা যায়। কুয়াশায় সূর্যালোক পড়লে আর-একজনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে, না হ'লে সে বন্দী হয়ে থাকে পুরনো গন্ধের ভিতর।

বর্তমানকে আধখানা ক'রে শম্পার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিল দীপ্ত। আসলাম চা দিয়ে গেল। পাপু বসেছে শম্পার গা ঘেঁষে, ছবি-আঁকার খাতাটা তুলে দিয়েছে শম্পার হাতে। যেন ওদের অন্তরঙ্গতা নতুন নয়। বাইরে ঝকঝকে রোদ। ওপরের ফ্ল্যাটে চড়া সুরে রেডিওগ্রাম খুলে দিয়েছে। চেনা গলা, সম্ভবত ন্যাট কিং কোলে।

অস্বস্তি কাটানোর জন্যে সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যেতে বলল আসলামকে। ডাক্তার কন্ট্রোল করতে বলেছিল, ভাবেনি —ফুসফুসে উত্তাপ সঞ্চারের জন্যে এটা তার দরকার। স্বাস্থ্য, শরীর এ-সব নিয়ে খুঁতখুঁত করতে ভালো লাগে না।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল দীপ্ত।

'সকালে এলে! আজ তোমার কলেজ ছিল না?'

'ছিল। গিয়েওছিলাম। একজন প্রফেসর মারা গেছেন, ছুটি হয়ে গেল।' শম্পা বলল, 'ফেরার পথে ভাবলাম, ঘুরে যাই। শুনেছিলাম শরীর খারাপ। তুই তো আমাদের খোঁজ-খবর নিবি না!'

'কথাটা ঠিক নয়।' দীপ্ত বলল, 'সারাক্ষণ এতো ঝামেলায় থাকি!...যাক্‌গে, সুজনের খবর কি? কলকাতায় আসে-টাসে?'

'আসছে, শীগ্রিই আসবে লিখেছে। কী সব নতুন প্ল্যান ঢুকেছে মাথায়! চাকরিটাও বোধহয় ছেড়ে দেবে—'

'হঠাৎ!'

'জানি না—'

পরবর্তী প্রসঙ্গের জন্যে ছটফট ক'রে উঠল দীপ্ত। শম্পাও যেন হঠাৎ গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। হয়তো মনে পড়েছে কিছু, হয়তো দীপ্ত তেমনভাবে সাড়া দিতে পারেনি। মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে এখন। সচেতনভাবে লক্ষ করল দীপ্ত, শম্পার সিঁথিটা এখন আগের চেয়ে বেশী চওড়া দেখায়, একটু শুকনোও। একদিন শম্পাদি তাকে টানত! অথচ, আজ, এখন, সে তেমন কৌতূহল বোধ করছে না কেন!

'পাপু, মাকে একটা ফোন করবে নাকি? বলো, শম্পাপিসী এসেছে—'

'না, না, থাক।' উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে উঠল শম্পা, 'শুধু শুধু ডাকছিস কেন! আমি এবার উঠবো—'

সত্যিই উঠে দাঁড়াল শম্পা। সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, 'তোকে খুব অন্যমনস্ক দেখছি! কী হয়েছে! বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া?'

'না, সে-সব কিছু নয়। শরীরটা খারাপ—।' অল্প হেসে বলল দীপ্ত। 'সুজন এলে খবর দিও। ও তো আসবে না, আমিই দেখা করব।'

'তার আগে তুই-ই আয় না একদিন। জয়িতা পাপুকেও নিয়ে আসিস। কী পাপু, আসবে তো?'

পাপু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। আসবে।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' হাত বাড়িয়ে পাপুর গাল টিপে দিল শম্পা। 'তুমি যেন তোমার বাবার মতো বড়ো সাহেব হয়ে যেও না—'

দীপ্ত বলল, 'খোঁচা দিচ্ছ! তুমিও—!'

'খোঁচা নয়। যা সত্যি তাই বললাম। তুই বড়ো হয়েছিস, আরো বড়ো হবি। তাতে কি অখুশী হবো আমি! আমি যে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি—'

কথাগুলোর অর্থ ঠিক বোধগম্য হলো না দীপ্তর। শুধু ক্ষীণভাবে মনে হলো, শম্পা হাত বাড়িয়েছে স্মৃতির দিকে। জানে না সকাল থেকে সে নিজেও বিচরণ করছে সেখানে। শম্পাদির হঠাৎ আবির্ভাবে যতোই আকস্মিকতা থাক, দীপ্তর

কাছে সেটা আকস্মিক নয়। সে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

যাবে ব'লে উঠেও দাঁড়িয়ে থাকল শম্পা। নতুন ক'রে অস্বস্তি শুরু হলো দীপ্তর। ভালো হতো জয়িতা বাড়ি থাকলে। দু'জন দীপ্ত তখন সহজেই একজন হয়ে যেতে পারত, অন্তত এতোখানি অসহায় লাগত না।

'তোর কাছে একটু দরকারেই এসেছিলাম, দীপ্ত। শরীর খারাপ, আজ আর বললাম না। তুই অফিসে যাচ্ছিস কবে?'

'যাব আজকালের মধ্যে। তুমি বলো না কী দরকার?'

আয়ার ডাক শুনে পাপু ছুটে গেল ঘরে। এখন ওর স্নান করার সময়। পাপুর ছেড়ে-যাওয়া জায়গাটার দিকে খানিক চুপচাপ তাকিয়ে থাকল শম্পা।

'একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। রতন—'

দীপ্ত ভুরু কোঁচকালো। এখন তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন।

'কী ব্যাপার বলো তো?'

'মনে নেই! একটা চাকরির জন্যে···তোদেরই অফিসে!'

'ও, হ্যাঁ। নাউ আই রিমেমবার···'

দীপ্ত আর এগুলো না। বিষয়টা তেমন জরুরী নয়। অন্য কেউ হ'লে গা করত না, পরিষ্কার ব'লে দেওয়া যেত, সরি, চান্‌স্ নেই কোনো। শম্পাদি বলেই অসুবিধে। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগল সে।

'এক মাস হয়ে গেল, এখনো কোনো খবর পায় নি। শুনলাম, তোদের ইণ্টারভিউ হয়ে গেছে—'

'ওয়েল, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ইণ্টারভিউ হয় নি এখনো।' তাড়াহুড়ো ক'রে কথাগুলো ব'লে একটু থামল দীপ্ত। পরে বলল, 'ও কি অন্য কোথাও চেষ্টা করছে?'

শম্পা সম্ভবত কিছু আঁচ করল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দীপ্তর দিকে।

'চেষ্টা করছে, সুজনকেও লিখেছি। ছেলেটি ভীষণ নিডি। কিন্তু খুঁটির জোর তো নেই! আমাকে ধরেছিল। আমার আর

জোর কোথায়! ভেবেছিলাম—'

কথাটা শেষ করল না শম্পা। হঠাৎ ব্যস্ততায় এগিয়ে গেল কয়েক পা।

'চলি—।'

'আমি দেখব।'

'দেখিস, যদি কিছু করার থাকে…'

লিফ্‌ট্‌ পর্যন্ত এগিয়ে দিল দীপ্ত। লিফ্‌ট্‌ না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। চুপচাপ। নেমে যেতে-যেতে শম্পা বলল, 'আসিস'। শব্দটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল না।

খুব সাবধানে দরজাটা বন্ধ করল দীপ্ত, যাতে কোনো শব্দ না হয়। আর এক দফা চা'র ফরমাস ক'রে পুরনো জায়গায় এসে বসল। সিগারেট ধরাল। পাপু রেডি না-হওয়া পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যই তার সঙ্গী। মনে হচ্ছে ঠিক হয় নি, একটা মিথ্যাকে পাশ কাটাতে গিয়ে নতুন ক'রে জড়াল নিজেকে! ভালো হতো যদি শম্পাদিকে পরিষ্কার ব'লে দিতে পারত, সম্ভাবনা নেই—রতনের দরখাস্তটা পৌঁছয়নি, আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলেছি! বলতে পারত, আমি অনেক বদলে গেছি, শম্পাদি, কে নিডি কে নয়, তা ভাবলে এখন আর চলে না আমার। তা না ব'লে পরোক্ষে সে আশ্বাসই দিল না কি? কেন! ভয়ে? লজ্জায়? নাকি এতোদিন পরেও শম্পাদির ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে ছোটো মনে হয়েছিল তার!

রিসেপসনিস্ট মেয়েটির চোখে খুব হাল্‌কা রঙের চশমা। সাদা কপালের মাঝখানে সূক্ষ্ম সবুজ রঙের টিপ। শাড়ি, ব্লাউজ, জুটোর রঙই সবুজ। এক হাতে পান্না-বসানো বালা, অন্য হাতে সবুজ ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ। প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে।

'মিস্টার রে, আপনি যান। মিস্টার মুখার্জী ইজ ফ্রী নাউ।'

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মুখার্জী সময় মেনে চলেন, ডিসিপ্লিন পছন্দ করেন। এ-সবই শোনা ছিল দীপ্তব। দেরী হতে পারে ভেবে মিনিট দশেক আগেই এসে পৌঁচেছিল, খবরও দিয়েছিল; কিন্তু পাঁচটা মানে যে পাঁচটাই এ-ধারণা ছিল না।

মেয়েটির দিকে সৌজন্যেব হাসি ছু ড়ে দিয়ে নিজের পোষাকটার দিকে তাকিয়ে নিল একবাব। না, খুঁত নেই কোথাও। নতুন সামার-স্যুটটা আজই প্রথম পরল। চমৎকাব ফীট করেছে গায়ে। পা বাড়াবার আগে সাফল্য শিহরণ তুলে গেল শরীরে। মুখার্জী নিজে যখন ডেকেছেন, তখন নিঃসন্দেহে ভাবা যায় স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের কফি-একাউন্ট হিন্দুস্থান ফস্টারে এসেছে ক্যাম্পেনের জোরে, সিন্‌হার তৎপরতায় নয়। এখন সে অনেক বেশী সহজ হতে পারে।

বাস্তবিক সহজ বোধ করছিল সে। ক্যাম্পেন প্রেজেন্ট করার কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, দিন সাতেক অফিসে যায় নি। তা'তে উৎকণ্ঠা প্রশমিত হলেও উদ্বেগ কমে নি। কোনো খবর না পেয়ে ভেবেছিল হাতছাড়া হয়ে গেল একাউন্টটা—ব্যর্থতা ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছিল বিষাদে। আশ্চর্য, যে-সিন্‌হাকে সে খুঁটি ব'লে ভেবে এসেছিল এতোদিন, যার ইচ্ছেয় সুনীতাকে টোপ ফেলেছিল, প্রেজেনটেসনের পর এ-নিয়ে সেই সিন্‌হাও একটিও কথা বলেনি। একদিন ফোন করেছিল দীপ্ত। দ্বিধাগ্রস্ত

গলায় সিন্‌হা বলল, 'এখনো কিছু ডিসিসন হয় নি লেট আস ওয়েট অ্যাণ্ড সী। ঘাবড়াবার কিছু নেই—।'

এ-ধরনের মন্তব্যে জোর পাওয়া যায় না কোনো। বরং সন্দেহ হয়। ভদ্রতার খাতিরে একেবারে নাকচ না ক'রে ধৈর্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। সব পাকা হয়ে গেলে রিগ্রেট লেটার পাঠিয়ে দেবে। অসুবিধে করছিল সিন্‌হার ওই 'ঘাবড়াবার কিছু নেই' কথাগুলো। নানারকম প্রলোভন আছে লোকটির, এবং এ-ব্যাপারে রামতনু সোমের চেয়ে দীপ্ত অনেক নির্ভরযোগ্য। খটকা থেকে গেল।

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটল অদ্ভুতভাবে। জয়িতাকে রিপোর্ট করা নিয়ে সমীরণের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না, দীপ্তর মেজাজ টের পেয়ে সমীরণও কাছে ঘেঁষেনি। চাপা যুদ্ধ। এমনকি, দীপ্ত অসুস্থ হওয়ার পরও খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেনি সে। একটার পর একটা ঘটনা ক্রমশ বিরূপ ক'রে তুলছিল দীপ্তকে, ভাবছিল প্রথম সুযোগেই সরিয়ে দেবে সমীরণকে। প্রায় এই-রকম সময়ে সমীরণই খবরটা আনল; হিন্দুস্থান ফস্টার সম্পর্কে ডিসিসন হয়নি এখনো, তবে স্টারলেট হিউম রিগ্রেট লেটার পেয়ে গেছে। চিঠি সই করেছেন স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টর নিজে।

খবরটা পেয়েই অফিসে ছুটে এসেছিল দীপ্ত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখন কলকাতায় নেই। মাদ্রাজে গেছেন নতুন অফিস খোলার ব্যাপারে, ফিরতে অন্তত সাত-আটদিন দেরী হবে। করণীয় সব কিছুরই দায়িত্ব তার। এ-ছাড়া আর একটা বিষয়েও তৎপর না হয়ে পারেনি দীপ্ত। কফি-একাউন্টের ব্যাপারে বিনয় চৌধুরীর অ্যাটিচুড আগাগোড়া একটু গোলমেলে লাগছিল তার —কোনোদিনই খুব একটা উৎসাহ দেখাননি ভদ্রলোক, এমনকি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করেছেন মাঝে মাঝে। ঘা খেয়ে বুঝেছিল দীপ্ত, চৌধুরী পরীক্ষা করছেন তাকে—ব্যর্থ হ'লে ভবিষ্যতের পথ বন্ধ।

তা ছাড়াও কারণ ছিল, যেটা বাড়িতে অলসভাবে চিন্তা

করতে করতে হঠাৎ অনুমান করেছিল দীপ্ত। মুখে যাই বলুন, চৌধুরী রামতনু সোমকে ভয় পান। সেই ভয় থেকেই নিজে না এসে এগিয়ে দিয়েছেন দীপ্তকে—যাতে, বাইরের জগতে অন্তত, নিজের ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে থাকে। সমীরণের খবরে এই চিন্তাটাই আবার ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল তাকে। এই একাউণ্টের কোনো কৃতিত্বই চৌধুরীকে নিতে দেওয়া যাবে না। লক্ষ্য ঠিক হয়ে আছে, আজ না হোক কাল, কিংবা কয়েকদিন পরে চৌধুরীর মুখোমুখি সে হবেই। হাতের তাসগুলি এখনই সাজিয়ে রাখা ভালো।

তারপর আজ—আজ সকালে। ফোন এলো। নারী কণ্ঠ; শুনেই বুঝল পুষি দত্ত, অশোক মুখার্জীর সেক্রেটারী।

'কন্‌গ্র্যাচুলেসন্‌স্!'

'হঠাৎ!'

'হঠাৎ!' পুষি এলিয়ে দিল নিজেকে, 'ট্রাইং টু বি নটি! বেশ, বেশ। আজ আসুন বিকেল পাঁচটায়, বস্ ডেকেছেন। ওঁর কাছেই শুনবেন।'

আর কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পুষিকে চেনে। সিন্‌হার খুব ঘনিষ্ঠ, সিন্‌হাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে অন্তত ফাজলামি করবে না পুষি। উত্তেজিত গলায় বলল দীপ্ত, 'মেনি থ্যাঙ্কস্, পুষি। আই প্রমিস এ স্কচ্...'

পুষি হাসল, 'বাই অল মীন্‌স্, ইউ শুড্!' তারপর সুর পাল্টালো, 'তাহ'লে বিকেল পাঁচটায়। মিস্টার মুখার্জীর সঙ্গেই দেখা করবেন আগে—'

শেষের কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। সম্ভবত সিন্‌হাকে এড়িয়ে যেতে বলল পুষি। কারণ আছে হয়তো। আপাতত সে-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কৌতূহলটা দমিয়ে রাখতে পারে সে।

দু'চারজন ছাড়া কাউকে জানাল না। রক্ত আজ এলোপাথাড়ি দৌড় শুরু করেছে শরীরে। একটানা বেশ কয়েকটা দিন বিষণ্ণতায়

ডুবে থেকে আজ আবার সে মাথা তুলেছে, নিজেরই তর্জনী উঠে এসেছে বুকের কাছে। সেখানে একটি মাত্র ধ্বনি—আমি, আমি, আমি। এর আগে ঠিক এমনি ক'রে কখনো উপলব্ধি করেনি নিজের অস্তিত্ব। তখনই অফিস থেকে বেরিয়ে, ঘণ্টাখানেক বারে কাটিয়ে, বাড়ি গেল পোষাক বদলাতে। আজ সে স্বতন্ত্র হবে। জয়িতাকেও দেওয়া যাবে খবরটা।

টানা তিন-চার ঘণ্টার উত্তেজনার পর এখন এসেছে প্রশান্তি। গভীর আত্মবিশ্বাস। তার ছাপ তার হাঁটার ধরনে, হাসিতে, স্বর প্রক্ষেপে—যেন এটাই স্বাভাবিক, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজে যতোই আস্ফালন থাক, যুদ্ধের পর, রিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে অসীম ক্ষমায় সে তাকিয়ে আছে তার ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে। নিপুণভাবে তৈরি ছিমছাম ও নিঃশব্দ করিডোরের মধ্যে দিয়ে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের মার্কেটিং ডিরেক্টরের অফিসের দিকে শান্ত অথচ ঋজু পা ফেলে হেঁটে যেতে-যেতে দীপ্ত না ভেবে পারল না—এই সেই পথ, যার ওপর দিয়ে দিনের পর দিন হেঁটে গেছেন রামতনু সোম—বিজ্ঞাপন-জগতের মীথ্‌; পালিশ-করা প্লাইউডের গায়ে এখনো হয়তো ছুঁয়ে আছে তাঁর নিঃশ্বাস! স্টারলেট হিউমে ট্রেনী হিসেবে ঢুকেছিল অনেক বছর আগে, তখন থেকেই রামতনুকে সম্বোধন করেছে 'স্যার' ব'লে, মুখোমুখি দেখা হ'লে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়েছে রাস্তা—এখন তাঁরই ছায়া মাড়িয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে সদর্পে। কফি-একাউন্ট পাওয়ার চেয়ে এইটাই হয়তো আরো বড়ো সাফল্য। হ্যাঁ, আমি কেরিয়ারিস্ট, চোয়াল শক্ত ক'রে ভাবল দীপ্ত, বাট আই ডিজারভ্‌ড্‌ টু বি সো!

'হাই দীপ্ত!'

'হাই পুষি!' পুষি দত্তের অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টাকে স্বাভাবিক ক'রে তুলল দীপ্ত, 'নিশ্চয়ই দেরী করিনি?'

'না, না।' পুষির হাতে উল-কাঁটা। আঙুল জুড়ে পরস্পরকে অতিক্রম করার খেলা। চিবুক হেলিয়ে বলল, 'ঢুকে পড়ুন।'

'থ্যাঙ্ক্‌স্‌!'

কাঠের দরজায় পুরু কুশন আঁটা, ঠেললেও শব্দ হয় না কোনো। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কম করেও ষোল বাই বারো হবে, ফার্ণিচাবের স্বল্পতায় পরিসরের প্রাচুর্য আরো বেশী চোখে লাগে। আগাগোড়া মেরুন কার্পেট বিছানো। ওরই মধ্যে বড়ো কাচের জানলার দিকে মুখ ক'রে রিভলভিং চেয়ারে ব'সে আছেন অশোক মুখার্জী—পিছন থেকে দেখা বলেই এই মুহূর্তের আচ্ছন্নতা অনুমান করা যায় না। তবে নিশ্চিত অন্যমনস্ক—না হ'লে টের পেতেন দীপ্ত ঘরে ঢুকেছে, অপেক্ষা করছে।

দীপ্ত শুনেছিল ভদ্রলোক অসুস্থ, ভুগছেন, ইতিমধ্যে অপারেশন হয়ে গেছে বাব দুয়েক। কিন্তু এতোখানি অন্যমনস্কতা আশা করেনি। একটু দ্বিধায় পড়ল সে। শেষে গলা পরিষ্কার ক'রে বলল, 'মে আই…'

'প্লীজ্।'

চেয়াবটা ঘুরে গেল। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে দীপ্ত লক্ষ করল ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠবার ভঙ্গি করলেন মাত্র, উঠলেন না। ঠোঁটেব কোণ দুটো কুঁকড়ে উঠল, সম্ভবত চাপা কোনো যন্ত্রণায়। ওরই মধ্যে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন—'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!'

'ওয়েলকাম টু স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভস্!' ভদ্রতায় হাত বাড়িয়ে দিলেন মুখার্জী, 'কনগ্র্যাচুলেসন্স্। আপনাদের ক্যাম্পেন আমরা অ্যাপ্রুভ করেছি। ইট্স্ গুড্, ভেরী গুড্।'

প্রত্যুত্তর হারিয়ে যাচ্ছে। অল্প দিশেহারা বোধ করল দীপ্ত। ঠিক কোন কথাটা বলবে বুঝতে পারছিল না। নিজস্ব আবেগে যতোটা না, তার চেয়ে বেশী অস্বস্তি লাগছে মুখার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রেজেন্টেসনের দিন দেখেছিল, তার আগেও কয়েকবার। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যেন চেহারার অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোকের। চোখ কোটরগত, ভাঙা গাল, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে পাশে। মুখ জুড়ে অস্বস্তিকর ধূসরতা। এ-রকম চেহারা ও

চোখমুখের সামনে নিজের সাফল্যকে বড়ো ক'রে দেখা যায় না। তবু, এটা অফিস, সম্পর্কটা অফিসিয়াল এবং সৌজন্যের, এই আলাপে নিছক ভদ্রতা ছাড়া অন্য কিছু বিনিময় করা শোভন নয়।

'ধন্যবাদ।' যতোদূর সম্ভব সংযত গলায় দীপ্ত বলল, 'আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ—'

'না, কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই। আমি আপনাদের কোনোরকম ফেভার করিনি—কাজ দেখেই দিচ্ছি।' ব'লে নিঃশ্বাস নিলেন, শরীরটাকে একবার পিছনে ঠেলে আবার ঝুঁকে এলেন সামনে। চেষ্টা করলেন হাসতে। তারপর বললেন, 'স্টারলেট হিউম আমাদের পুরনো এজেন্সী, রামতনু সোম আমার বন্ধুই বলতে পারেন। কিন্তু আপনাদের কাজ আমাদের ভালো লেগেছে। ...কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই—'

পর পর অনেকগুলো কথা। কিছু প্রশংসার, কিছু নীতির। সম্ভবত 'কৃতজ্ঞ' কথাটা ব্যবহার করা উচিত হয় নি। খুব যে ভেবেচিন্তে বলেছিল তাও নয়। মুখার্জী ঘুরছেন ওই কথাটিকে কেন্দ্র ক'রে। একটু দমে গেল দীপ্ত; শুরু করার মতো নতুন কোনো প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'খুব দেরী হয়ে গেল জানাতে। আই অ্যাম সরি!' মুখার্জী বললেন, 'দোষ আমারই...শরীরটা ভালো ছিল না।'

ঠিক এই ভাষায়, এইভাবে কথাগুলো বলার দরকার ছিল না। যেন নতুন কিছু শুনছে, যা প্রতিদিনের অভ্যস্ততায় অত্যন্ত বেমানান। দীপ্ত ব্যক্তিগত হওয়ার চেষ্টা করল।

'কিছুদিন আগেই তো অপারেশন হলো!'

মুখার্জী হাসলেন। অস্বস্তি লুকোতে পারলেন না।

'কী যে হয়! হয়তো আবার...'

কথাটা অসম্পূর্ণ থাকল। চেয়ারটা জানলার দিকে অল্প ঘুরিয়ে নিলেন মুখার্জী।

পড়ন্ত বেলা, তবু রোদের আভা যায় নি এখনো। কাঁচের স্বচ্ছতার জন্যেই সম্ভবত কলকাতাকে এখান থেকে খুব কাছের

দেখায়। সোজাসুজি তাকিয়ে হাওড়া ব্রীজের মাথা দুটো দেখতে পেল দীপ্ত। এখনই সেখানে জ্বলে উঠেছে তীব্র লাল। কাছেই কোথাও নতুন বাড়ি উঠছে। এতোক্ষণ খেয়াল করেনি—পাইলিংয়ের ধাতব শব্দটা কানে আসতেই কপালে ঘাম টের পেল দীপ্ত। নিখুঁত চেম্বারের নিয়ন্ত্রিত তাপ কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না তাকে। আগাগোড়া অস্বস্তির মধ্যে সে শুধু অনুভব করল, সাফল্যের প্রথম ধাক্কাটা পেরিয়ে এসেছে। মুখার্জীর আপত্তি থাকলেও সে কৃতজ্ঞ বোধ করতে বাধ্য।

চা এলো। সঙ্গে সরঞ্জাম। কাপ একটি। দীপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আঁচ করলেন মুখার্জী।

'আমার বারণ আছে। প্লীজ হেল্প ইওরসেল্ফ্…।'

যন্ত্রণার ভাবটা হঠাৎ যেন অন্তর্হিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এলেন মুখার্জী।

'রামতনু সোমকে নিশ্চয় চেনেন?'

কাপে চুমুক দিয়ে ঘাড় নাড়ল দীপ্ত।

'স্টারলেটে ট্রেনী হয়ে ঢুকেছিলাম আমি…প্রায় তিন বছর ছিলাম।'

'আই নো। আপনার হয়তো মনে নেই, আপনাদের ইণ্টারভিউয়ের সময় আমিও ছিলাম।' সন্দেহে তাকালেন মুখার্জী। 'অবশ্য আমারও মনে থাকার কথা নয়। রামতনু রিমাইণ্ডেড মী।'

'উনি নিশ্চয়ই খুব শক্ড্ হয়েছেন?'

'শক্ড্!' মুখার্জী এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, যেন প্রশ্নটা আশা করেন নি। একটু ভেবে বললেন, 'বিজনেসের কথা ভাবলে নিশ্চয়ই! কিন্তু রামতনু নোজ হাউ টু ফেস্ ইট। উনি আপনার প্রশংসাই করেছেন।'

অনেক উঁচুতে চ'লে যাচ্ছেন রামতনু। দীপ্ত বুঝতে পারে—আঘাতটা রামতনুর একার নয়, অশোক মুখার্জীরও। এটা আশাতীত; হয়তো রামতনু সোমের নতুন চাল—হয়তো নয়, কিন্তু পরাজয়ের মধ্যেও কয়েক পা এগিয়ে গেছেন তিনি। দীপ্ত

হঠাৎই অনুভব করল, খানিক আগে 'কনগ্র্যাচুলেসনস্' ব'লে যিনি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হাত, তিনি স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভসের মার্কেটিং ডিরেক্টর, অশোক মুখার্জী নন। ব্যক্তির কাছে পৌঁছুতে হ'লে এখনো অনেকদূর যেতে হবে তাকে।

বেলা ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। বিভিন্ন আয়তের রূপে কাঁচের জানলাগুলো ছায়া ছড়িয়েছে দেয়ালে। আশেপাশে একবার বিভ্রান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল দীপ্ত। জুলাইয়ের শেষ; এখন ক্রমশ ছোটো হবে দিন। তাপ কমবে রোদের। একটু আগে—এখানে আসতে আসতে—আত্মচেতনায় ডুবে গিয়ে হঠাৎই একটা উপমা মনে এসেছিল; দিনান্তের ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যমনস্ক হলো সে, ভাবল; ক্রমশ ঠাণ্ডা হবে রক্ত। বয়স ক্ষমা করবে না, বয়স বাধ্য হবে সরে দাঁড়াতে। কিন্তু, আজ থেকে অনেক বছর পরে, সরে যেতে গিয়েও সে কি পাবে রামতনু সোমের মর্যাদা!

'তাহ'লে মিস্টার রে,' আকস্মিক গলায় বললেন মুখার্জী, 'আপনার কিছু বলার আছে?'

'না। মানে···', ইতস্তত ক'রে বলল দীপ্ত, 'আমরা কি কাজ শুরু করতে পারি?'

'বাই অল মীন্স্! ফ্র্যাঙ্কলি, দু'মাসের বেশী সময় আপনারা পাচ্ছেন না, হয়তো আরো কম। পুজোর আগেই আমরা প্রোডাক্ট লন্চ্ করতে চাই।'

'ও কে, স্যার। তাই হবে।'

'গুড্।' দু'হাতের আঙুল জুড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন মুখার্জী, কপালে ভাজ পড়ল কয়েকটা। হয়তো এটা যন্ত্রণা শুরুর আভাস। ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললেন, 'আপনি তো মিস্টার সিন্হাকে চেনেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন। আমাদের কিছু সাজেসান্স্ আছে—মাইনর সাজেসান্স্। সেগুলো খেয়াল রাখবেন। কাল আমাদের অফিসিয়াল কনফার্মেসন পেয়ে যাবেন। সিন্হা উইল গীভ ইউ দি ডিটেল্স্ ··'

মুখার্জী বেল টিপলেন। হাতটা আবার বাড়িয়ে দিলেন দীপ্তর দিকে।

'উইশ ইউ অল দি বেস্ট্।'

করমর্দন ফেরৎ দিয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল দীপ্ত। মুখচোখ দেখে মনে হয় ক্লান্ত বোধ করছেন মুখার্জী, এর বেশী আলাপে উৎসাহ নেই। তার নিজের দিক থেকেও প্রয়োজন কম। মনে মনে খুশীই হলো সে—আজকের সুযোগের জন্যে ধন্যবাদ দিল ঈশ্বরকে। মুখার্জী তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেননি। এটা ভালো, দীপ্ত না ভেবে পারল না, অন্তত এই একটা একাউণ্টে বিনয় চৌধুরী কোনো কৃতিত্ব দাবী করতে পারবেন না। এটা তারই সাম্রাজ্য; এখন তাকে এগোতে হবে আরো বেশী বিস্তৃতির দিকে। জিবটা গালের একদিকে ঠেলে দিয়ে আত্মবিশ্বাসে শাণ দিল দীপ্ত।

পুষি দত্ত ঘরে ঢুকেছে। মুখার্জী নির্দেশ দিলেন, 'এঁকে মিস্টার সিন্‌হার কাছে নিয়ে যান—'

পৃথিবী পুষ্ট হয়ে আছে বহুতর সম্ভাবনায়। দীপ্ত ঘড়ি দেখল। প্রায় পৌনে ছ'টা, হিসেবমতো হিন্দুস্থান ফস্টার বন্ধ হয়ে যাবার কথা। তবু অপেক্ষা করবে অনেকে—অন্তত সমীরণ, হয়তো মুস্তাফীও। সকালে পুষি দত্ত টেলিফোন করার পর যে-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তার কতোটা খুশীর দিকে, কতোটা না—দীপ্তর চেয়ে বেশী তা আর কে বুঝবে! প্রচেষ্টা যতোই সম্মিলিত হোক, সমীরণরা জানে এটা দীপ্তরই জয়, আর কারুর নয়। নিশ্চিত হয়েও তাই তারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সেই অনিশ্চয়ের জন্যে ভাগ্য ছাড়া আর কেউই যা সৃষ্টি করতে পারে না। কী হবে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাড়াহুড়ো ক'রে! ছড়ে-যাওয়া ক্ষতে আয়ডিন ছড়াবার জন্যে এখনো পড়ে আছে সময় —বাড়িতে টেলিফোন আছে, কাল সকালেও দেখা হতে পারে। সে ব্যস্ত হবে কেন!

'সো—', পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গা ঘেঁষে

এলো পুষি, 'আমার স্কচ্ কোথায় ?'

একটা চড়া গন্ধ নাকে এলো দীপ্তর। এসেন্স আর ল্যাকারের মিলিত আক্রমণে ভারী হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। সম্ভবত পুষি এ-রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এখন প্রগল্‌ভ হচ্ছে।

হাল্‌কা মেজাজে দীপ্ত বলল, 'স্কচেই হবে ?'

'উম্, ম্যান, ইউ হ্যাভ লার্নট্ দ্য ট্রিক্‌স্! আমি ছাড়ছি না…'

'কাল পাঠিয়ে দেবো—'

'কাল !' আঁচল নেমে গেছে। বিস্ময়ের ঢঙে আটত্রিশ থেকে চল্লিশে বুক নিয়ে গেল পুষি। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'সেলিব্রেট করুন ! হোয়াই নট দিস ইভিনিং ?'

জবাব না দিয়ে সিন্‌হার ঘরে ঢুকে পড়ল দীপ্ত। পিছনে পুষি। টেবিলে পা তুলে 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সিন্‌হা। পা দুটো নামিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। উঠে দাঁড়াল।

'ছাড়া পেলে ?'

'হোপ সো—।' কাঁধ তুলল দীপ্ত। পরে বলল, 'তোমাকেই প্রথম ধন্যবাদ জানানো উচিত। আফটার অল ইট ওয়াজ ইউ—'

'পরে হবে।' পুষি বেরিয়ে যাচ্ছে। সিন্‌হা বলল, 'কী ব্যাপার ! ওল্‌ড্ ম্যান যায় নি এখনো ?'

পুষি চোখ টিপল।

'আসছি—'

শূন্য পাইপটা টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে সিন্‌হা হাসল। চতুর হাসি। ড্রয়ার টেনে একটা নতুন সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে ছুঁড়ে দিল দীপ্তর দিকে।

'আমি আগেই জানতাম। ওল্‌ড্ ম্যানের খুব ইচ্ছে ছিল না—আমিই জোর করলাম। না হ'লে একাউন্টটা স্টারলেটেই যেত। এই মীটিংটা ফর্মালিটি ছাড়া কিছু নয়।'

'জানি।'

দীপ্ত সংক্ষিপ্ত হলো। এতোদিন সন্দেহ ছিল, এই মুহূর্তে সিন্‌হার আত্মপ্রচারের চেষ্টা থেকেই ধরতে পারল, লোকটা মিথ্যে

ব'লে গেছে এতোদিন। এখন, কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর, চাইবে নিজেকে কায়েম করতে। মুখে হাসি থাকলেও সিন্‌হার অস্বস্তি চোখ এড়াল না দীপ্তর। লোকটা ধূর্ত, এ-সবই নতুন কোনো প্রস্তাবের ভূমিকা। সিন্‌হাকে লুকিয়ে হিপ পকেটে ওয়ালেটটা অনুভব ক'রে নিল দীপ্ত। হয়তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। হোক, সে তৈরি হয়েই এসেছে। আজ একটা বিশেষ দিন, এমনকি ঘৃণা করার জন্যেও আজ সে অপব্যয় করতে পারে।

বেশ গম্ভীর মুখে প্যাকেটটা খুলল দীপ্ত। লাইটারটা তুলে নিল।

'মুখার্জী সাহেব আবার অসুস্থ হয়েছেন মনে হলো?'

'অসুস্থ!' চোখ ছোটো ক'রে আনল সিন্‌হা। স্থির দৃষ্টি ফেলল দীপ্তর মুখে। 'কিছু লোক থাকে, যারা চেয়ারের লোভ কাটাতে পারে না—চিতায় চড়ালেও আবার ফিরে আসে চেয়ারে। হি ইজ সাচ্‌ এ টাইপ!'

'মানে!'

'ভেরী সিম্‌পল্‌! চাকরির লোভ। আর কেউ হ'লে অনেকদিন আগেই রিজাইন করত। রোগটা কি জানো?'

'না—'

'ক্যান্সার।'

'হোয়াট!'

'ক্যান্সার।' পাইপটা মুখের ভিতর ঠেলে দিল সিন্‌হা। ধোঁয়া টানার ব্যস্ততায় চোয়াল নাড়ল দ্রুত। চিবিয়ে বলল, 'বোধহয় এখান থেকেই ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যেতে হবে।'

থোকা থোকা জ্বালা নির্গত হচ্ছে সিন্‌হার পাইপের ধোঁয়ায়। মুমূর্ষুর জন্যে করুণা ভিক্ষা করার জায়গা এটা নয়। অন্তত সিন্‌হার কাছে সে-রকম কোনো বোধ আশা করাও অন্যায়। এমনও হতে পারে, সিন্‌হা যা বলছে তার সবই সত্যি। কিছুটা অসহায়ভাবে ডান হাতটা চোখের সামনে মেলে ধরল দীপ্ত।

একটা টাটকা উত্তাপ সেখানে ছুঁয়ে আছে এখনো—অদৃশ্যে কোথাও বিস্তৃত হতে চাইছে একটা ক্লিষ্ট হাসি। মাত্র কিছুক্ষণ আলাপের স্মৃতি থেকে ক্রুশ করার ধরনে হাতটা সে নিয়ে গেল কপালে ও বুকে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, দীপ্ত। যতোক্ষণ আমি আছি, একাউণ্ট লুজ করার সম্ভাবনা নেই।'

'জানি।'

পুষি ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া গন্ধটাও। উগ্র অথচ চাপা—নিঃশ্বাসে মিশে হঠাৎই চ'লে যায় মাথার দিকে, রগের শিরাগুলো কেঁপে ওঠে অল্প। মনে হয় এক প্রস্থ প্রসাধন সেরে এলো পুষি। তাকে ঘুরে চ'লে গেল সিন্‌হার দিকে, প্রায় সেই নৈকট্যে—অন্তরঙ্গতা যেখানে শোভনতার সীমা মানে না।

'গেছে ?'

'জাস্ট নাউ—'

পুষির কোমরেব অনাবৃত মাংসে আঙুলের দাগ টানল সিন্‌হা।

'চেক্ করলে ডাক্তারের সঙ্গে ?'

পুষি মাথা নাড়ল, একটু বা অপ্রস্তুতভাবে। তাকাল দু'জনেরই মুখের দিকে।

'মিস্টার রে, এটা খুব কনফিডেনসিয়াল। আর কাউকে বলবেন না।'

একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেল দীপ্ত। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ব্যবচ্ছেদ করল পুষি দত্তের কথার প্রতিটি শব্দ। বলতে গেলে আজই প্রথম অশোক মুখার্জীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার ; আজই, এতোদিনের মধ্যে, স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভ্‌সের সঙ্গে যে-কোনো সম্পর্কে যুক্ত হলো। সিন্‌হা যতোই অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করুক—হি ইজ নট মাই কাপ অফ টী, মানুষ হিসেবে তাকে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি দীপ্ত। তবু মেনে নিয়েছে, সেটাই চাকরির দাবী। এর বাইরে এমন কোনো

ভূমিকা তার নেই, যা থেকে এই প্রসঙ্গে জড়াতে পারে নিজেকে। পুষি দত্তের কথাগুলো তাই তীব্র হয়ে বিঁধল।

রাগ সংযত করার চেষ্টায় ক্রুর হয়ে উঠল মুখ। পুষি দত্ত মেয়ে না হ'লে দ্বিধায় পড়ত না এতো। কিন্তু, এই দ্বিধাও সে কাটিয়ে উঠবে। পুষিকে চেনে সিন্‌হার মাধ্যমে—বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে থাকে না, সিন্‌হার সঙ্গে সম্পর্কটাও নিতান্ত প্রাঞ্জল নয়। প্রচণ্ড মদ্যপ অবস্থায় একদিন পুষির শরীর বর্ণনা করেছিল সিন্‌হা। স্তন-কোমর-নিতম্ব বেষ্টিত সেই শরীরে সিন্‌হা যতোই আহ্লাদ পেয়ে থাকুক, আরকে-ভেজানো একটা অস্থির মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কোনো ছবি খুঁজে পায় নি দীপ্ত। মনে হয় সেই সম্পর্কের জের টেনে নিজেও কিছুটা এগিয়ে আসতে চাইছে পুষি—ভুলে গেছে দীপ্তর সঙ্গে তার ব্যবধান, ভুলে গেছে এক্সিকিউটিভ আর এক্সিকিউটিভ-এর পি,এ-র মধ্যে ব্যবধান পাহাড় আর পাহাড়-সংলগ্ন সমতলের মতোই দুস্তর! এটা অসহ্য!

ক্রোধ থেকে চাপা হাসি ফুটে উঠল দীপ্তর ঠোঁটে।

'থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস ডাট, আমি জানতাম না এটা কনফিডেন-সিয়াল! না বললে আমি হয়তো রটিয়ে দিতাম!'

'না…মানে…মিস্টার মুখার্জীও এখনো জানেন না। আমরা শুধু গেস করছি।'

আরো একটু মাংস অধিকার ক'রে নিয়েছে সিন্‌হা। গাছের পুরু গুঁড়িতে গোসাপের মতো লেপ্‌টে আছে হাতটা। দু'থাক চর্বিতে চোখ আঁটকে গেল দীপ্তর।

'এই ঘটনায় আমার কী ইণ্টারেস্ট থাকতে পারে!'

গলার ঝাঁঝ লুকোতে পারল না দীপ্ত। পুষি না বুঝুক, বিরক্তিটা এবার পরিষ্কার টের পেল সিন্‌হা।

'লেট আস নট ডিসকাস ইট। দীপ্ত, আই হেল ইওর সাক্‌সেস্। সেলিব্রেট করবে তো?'

'সিওর।' উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্ত বলল, 'মিস্টার মুখার্জী তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ফারদার আলোচনার জন্যে। কবে হতে

পারে মীটিংটা ? কাল ?'

'রাইট।...কিন্তু, তুমি কি চ'লে যাচ্ছ ?'

'টায়ার্ড।'

'কী হলো, দেখে তো মনে হচ্ছে না !'

'আজ থাক। কাল মীটিংটা হোক, কালই সেলিব্রেট করা যাবে।'

ক্রমশ স্বচ্ছন্দ হলো দীপ্ত। পুষিকে দেখল। সম্ভবত একটু বেশীই রূঢ় হয়ে পড়েছিল তখন। পুষি কিছু মনে করলে সিন্‌হাও করতে পারে। মুখার্জীর সঙ্গে কথা বলার পর এখন আর একাউন্ট পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে ভাবনা নেই। তবু—সমীরণ যে-রকম বলে মাঝে মাঝে—ক্লায়েন্ট লক্ষ্মী। যতোদিন না স্টেডি হচ্ছে সবকিছু, অন্তত ততোদিন মেনে নিতে হবে চুনোপুটি থেকে চাঁই পর্যন্ত তার সমস্ত বোকামি আর ঔদ্ধত্য। কে বলতে পারে পুষি দত্তকেও কখনো দরকার হবে না তার! মাংসময় এই জীবটিকে, দীপ্ত ভাবল, ঘৃণা করতে করতেও সে সম্বোধন করবে 'ডারলিং' ব'লে। আজ নয়। কিন্তু কাল, বা পরশু, যে-কোনো দিন থেকে।

খোশামোদের গলায় দীপ্ত বলল, 'আই প্রমিস্‌ড্‌ হার এ স্কচ্‌।'

থমথমে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল পুষি। আবার চঞ্চল হয়ে উঠল সিন্‌হার আঙুলগুলো।

'সত্যি !'

বাঁ হাতের মধ্যমা ও তর্জনী তুলল দীপ্ত, 'ভি' দেখাল।

'চলি।'

'সুনীতার খবর কি ?'

'ভালো।'

সিন্‌হাও উঠল। পাইপটা মুখে নিয়ে টানল বার দুই। নিবে গেছে। চোখ দুটো ছোটো হয়ে এলো।

'কাল সুনীতাকেও আনছ নিশ্চয়ই ?'

চট ক'রে কোনো জবাব দিল না দীপ্ত। অনেকক্ষণ থেকেই

এই প্রশ্নটির অপেক্ষা করছিল সে, ভেবেছিল পেরিয়ে যাবে। সিন্‌হা ভোলে নি। কী বলবে ভাবার আগেই ভেবে নিল, কি কি বলবে না। এটা তার একটা ভুল, ইচ্ছে করলেই এড়িয়ে যেতে পারত। এখন দেরী হয়ে গেছে।

'আমার থাকাই যথেষ্ট। সুনীতা কী করবে!'

'নিয়ে এসো।' চতুর ভঙ্গিতে হাসল সিন্‌হা, তাকাল পুষির দিকে। 'উই ওয়ান্ট টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য টীম।'

দীপ্ত পকেট হাতড়াল। না, এখন সিগারেট ধরিয়ে লাভ নেই। মাথার পিছন থেকে একটা শীতল অনুভূতি নেমে যেতে দিল মেরুদণ্ড বেয়ে। স্ট্র্যাটেজি সরে যাচ্ছে পাশে, ধৈর্যের ওপর স্তর পড়ছে নিজস্ব রক্তের। মাথা জুড়ে শুধু একটিই প্রতিধ্বনি : বাস্টার্ড্, বাস্টার্ড্, বাস্টার্ড্! আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত মনে হচ্ছে নিজেকে। দীপ্ত কি বলবে, কফি-একাউন্টে সুনীতাকে পাওয়া যাবে না ; কাজকর্মের দায়িত্ব হিন্দুস্থান ফস্টারের —কোনো ব্যক্তির নয়! কিংবা, ব্যক্তির হলেও, তা দীপ্তর হতে পারে, সুনীতার নয়। আফটার অল, সুনীতা পুষি দত্ত নয়। তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমার।

না। এখনো সময় হয় নি। অসহায়ভাবে নরম হয়ে এলো দীপ্ত।

'দেখি—'

তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে।
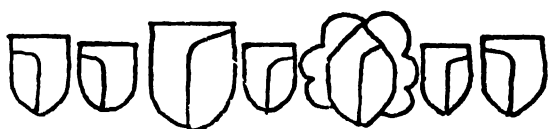
একদিন ভোর রাতে শীতে কুঁকড়ে উঠল দীপ্ত। ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

আলীপুরের আকাশে ঘোর কাটে নি তখনো, একটি কি দু'টি পাখি ডাকতে শুরু করেছে। জানলার বাইরে তারা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হাওয়ায় বেশ টান, অল্প ছ্যাঁকছ্যাঁকে ভাবও আছে। বর্ষা শেষ হতে চলল ; শীতে ঢুকে পড়ার আগে এ-সময় সাধারণত গরম হয়ে ওঠে হাওয়া—এবার সে-রকম কিছু হয় নি। বরং শীত-শীত লাগছে একটু। গ্রীষ্মের দুপুরে হঠাৎ জ্বর আসার মতো দুটো সমান স্রোত বইছে শরীরে। ঘামে সিরসির করছে গলার খাঁজ আর কানের পাশ দুটো, ঘাম চোখের তলায়, মুখের ভিতর জিবটা আটকে আছে শুকনো তুলোর মতো। দিনের বিভিন্ন তারতম্যের মধ্যে এমন একটা সময়ও যে আছে—যখন ঘাম, ক্লেদ, শূন্যতায় আত্মবোধ হারিয়ে যায় পুরোপুরি, এটাও সে বুঝতে পারছিল না।

বিছানার ওপর প্রায় উবু হয়ে বসেছে দীপ্ত। বেশ কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হলো, এটা তার স্বাভাবিক জেগে ওঠার ভঙ্গি নয়। স্বপ্ন ও জেগে ওঠার মধ্যবর্তী কোনো একটা জায়গায় এই ভঙ্গিতে এসে থেমেছিল সে। দূরে, ব্রীজের ওপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে শেষ রাতের মালগাড়ি। ঠিক এই সময় আত্মহত্যার জন্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নেই কেউ—তবু দীর্ঘ, আনুনাসিক শব্দে হুইসিল্ দিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। যেতে যেতে, থেমে থেমে। নাকি এরও আছে আলাদা কোনো তাৎপর্য, আত্মঘাতী হতে চেয়েও যে ফিরে গেছে আত্ম-সংবরণের দিকে, তাকে ফিরিয়ে আনা আবার!

শীত-কাতর নিজের শরীরটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করল দীপ্ত। কিছু বা ফিরে পেল নিজেকে। না, ঠিক আছে। ভুলে ভয় পেয়েছিল। সব ঠিক আছে।

ঘরের অন্ধকারটা চোখ-সওয়া হয়ে এলো। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জয়িতা—হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাচ্ছে তাকে। আরো একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তার ঠাণ্ডা কপালে হাত দিল দীপ্ত, নাক ও ঠোঁট ছুঁয়ে হাতটা নেমে এলো বুকের দিকে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঠিকই। মুখে অস্ফুট শব্দ ক'রে পাশ ফিরল জয়িতা। একটা আল্‌গা হাত উঠে এলো দীপ্তর কোলে।

আস্তে হাতটা সরিয়ে দিল দীপ্ত। অন্ধকারেও সুন্দর জয়িতা, গায়ের চমৎকার আভা লুকোতে পারে না। এই মুহূর্তে তার স্তব্ধ অবয়বের দিকে তাকিয়ে বিছানা থেকে নেমে লিভিংরুমের দিকে পা বাড়াল দীপ্ত; স্যুইচ্‌ খুঁজে আলো জ্বালল। আড়াই-হাজারের সৌজন্য দেখিয়ে বসতে ডাকছে সোফা-সেট; মভ্‌রঙ কার্পেটের কোথাও এতোটুকু দাগ পড়েনি পায়ের। অথচ হাঁটাচলা কম সয়নি! গ্লাসটপের ওপর ঝকঝক করছে পরিচ্ছন্ন অ্যাশট্রে, সকালে আবার পালিশ পড়বে এ-সবের গায়ে। জানে দু' এক পা এগোলে দেয়ালে আড়াল-হওয়া ফ্রীজে ধরা পড়বে একই সুন্দরের আভা—ডাইনিং টেবিলের দামী ফিনিশে পিছলে যাবে আলো। কোনোখানে হেরফের হয় নি এতোটুকু। আর-একটু এগোতেই স্তব্ধতা থেকে জেগে উঠল যামিনী রায়ের নারীমুখ—ওয়াল্‌র‍্যাক থেকে 'হ্যালো' বলল শেলী, কীট্‌স্‌, কোলরিজের লেদার বাইণ্ডিং, পেপারব্যাকের ইয়েভ্‌টুশেংকো, বার্গম্যানের চিত্রনাট্য, আর হালে সংযোজিত 'ম্যান অ্যালোন'। পড়বে, সবই পড়বে আস্তে আস্তে, সময় ক'রে, নিজের মতো মর্জি মিশিয়ে। যাকে যেভাবে যেখানে রাখতে চেয়েছিল, সব তেমনিই আছে। ভোর রাতের নিঃশব্দ ভ্রমণে এদের শরীর থেকে উঠে-আসা স্তব্ধতার গন্ধ ছুঁয়ে গেল দীপ্তকে।

চোখে পড়ল পাপুর ঘর। ভিতরে হাওয়া নেই তেমন, তবু অল্প অল্প দোল খাচ্ছে পাপুর ঘরের পর্দা। এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল দীপ্ত। বিছানায় হাত পা মেলে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে পাপু, শেষ রাতের আলো আঁধারে অস্পষ্ট মুখে ভঙ্গি নেই কোনো। ওদিকে

মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে আছে আয়া। খুঁজে পেতে না দেখলেও এ-সব দৃশ্য ধরা পড়ত চোখে। সম্ভবত এখানেও বিভ্রম নেই কোনো।

পর্দাটা তুলে রেখে আর-একটু সময় অপেক্ষা করল দীপ্ত। আস্তে ডাকল, 'পাপু—?'

ডাকটা স্পষ্ট হলো না। উৎকণ্ঠায় এখনো বুঁজে আছে স্বর, বেখাপ্পা শোনাল। ঢোঁক গিলে আবার ডাকল, 'পাপু?'

'উঁ —', এবার উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গে।

দীপ্ত আশ্বস্ত হলো। পাপু জানল না, ঘুমের মধ্যেও কী অদ্ভুতভাবে সাড়া দিয়ে গেল সে। বড়োই পাত্‌লা ঘুম ছেলেটার। এমনও হতে পারে, জেগে-ওঠার আগে আধোঘুমে অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে। খুব সকালেই ঘুম ভেঙে যায় পাপুর, হয়তো তাই উত্তরটা এলো তাড়াতাড়ি।

দীপ্ত আশ্বস্ত হলো। দুটো সরু ঘামের রেখা কানের পাশ দিয়ে নেমে গেল ঘাড়ের দিকে। জয়িতা, পাপু, ঘর, দেয়াল, আসবাব—প্রকৃতিস্থ পৃথিবীতে এর বেশী কোনো সম্পদ নেই তার, নেই আর কোনো বিনিময়ের সুযোগ, যা থেকে, ভাবতে পারে দীপ্ত, বঞ্চিত হয়েছে সে। বাড়ি থেকে দূরে যখনই একান্ত হয়, তাকে আঁকড়ে ধরে এ-সবের টান। এই সেদিন, বম্বে থেকে কলকাতা ফেরার সময়, পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে বোয়িং-এর জানলায় বসে, মেঘের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আকস্মিক শঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল বুক। হঠাৎ যদি কিছু হয়, ভেবেছিল, নির্বিকার শূন্যে তার দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যাওয়ার আগে বহু দূর আলীপুরের ছিমছাম নিরাপত্তার মধ্যে ব'সে ওরা কি টের পাবে—তাদের কথা ভাবতে ভাবতে অন্তর্হিত হলো একজন!

সে-সব্ বাইরের কথা, দূরত্বের ভাবনা। কিন্তু এখন এমনি হবে কেন!

আলোটা নিবিয়ে দিল দীপ্ত। ভোরের আলো ফুটতে দেরী আছে এখনো। এখন স্বচ্ছন্দে গিয়ে সে শুয়ে পড়তে পারে

জয়িতার পাশে। সারা রাতের ঘুমে নরম হয়ে-আসা নারী শরীরে মিশে, প্রার্থনা করতে পারে আর এক প্রস্থ ঘুমের—নিজস্ব ঘুম, যার মধ্যে দুঃস্বপ্ন নেই কোনো। নেই আক্রমণ। আশ্চর্য ! সব ঠিক আছে, তবু সে এখনো নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কেন !

জয়িতাকে ওঠাবে ? বলবে তার অস্বস্তির কথা ?

না, থাক। ভারী সুন্দর মুখশ্রী ঘুমন্ত জয়িতার, তাকে আর বিচলিত করবে না। সুখে সজীব হতে হতে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি ক্রমশ উবে গেছে জয়িতার মুখ থেকে, আবার তাদের ফিরিয়ে আনতে কষ্ট হবে। বরং ভোর হোক। ঘাম শুকিয়ে আসছে ক্রমশ, জিবে স্বাদ অনুভব করতে শুরু করেছে আবার। বোধহয় হাওয়া বইতে শুরু করল। কোনো শব্দ না ক'রে দরজা খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল দীপ্ত। দূর থেকে এগিয়ে আসছে শব্দটা—আর-একটা ট্রেন, বিপরীতগামী এঞ্জিনের হুইসিল্ নতুন কোনো ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করল না তাকে।

মনে পড়ল 'উষা' কথাটা, পুবে তার আভা। আকাশে তাকালে মিহি অন্ধকারে এখনো চিনতে পারে শুকতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডলী। আস্তে আস্তে পাখির গলায় ভ'রে উঠছে চারদিক, ক্বচিৎ হাওয়ার দমকায় ছড়িয়ে পড়ছে শিউলির গন্ধ। বুক ভ'রে নিঃশ্বাস টানল দীপ্ত। সামনে ফাঁকা রাস্তা। ভয়াবহ রকমের ফাঁকা, হঠাৎ দেখলে মনে হবে নিষিদ্ধ হয়ে আছে, এই রাস্তায় কোনোদিন কেউ হাঁটবে না। আলীপুরে আসার আগে নির্জনতা খুঁজেছিল সে। এই সেই নির্জনতা !

রাস্তা একটাই, দু'জন দীপ্ত। প্রত্যূষের আবহে বহুদিন পরে দৃশ্যটা আবার সে ফিরিয়ে আনতে পারল, চোখের এতো কাছে যে মনেই হয় না ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে কুড়ি-একুশটা বছর।

সেদিনও রাস্তা ফাঁকা ছিল এমনি, অন্ধকার আরো একটু বেশী। পালা ক'রে মা'র সঙ্গে রাত জাগছিল সে। অলিপ্ত ছোটো তখন, অনিচ্ছের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ত তাড়াতাড়ি। সেও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল ? আজ ঠিক মনে নেই। শুধু মনে পড়ে

মা'র সেই কণ্ঠস্বর ঃ 'খোকা, একবার যা বাবা। হরেন ডাক্তারকে নিয়ে আয়। আমি যেন নাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না!' ঘুম চোখে তখনই লক্ষ করেছিল বাইরে বিষম রাত—ভয়ে সেঁধিয়ে এসেছিল হাত-পা। তবু মফঃস্বলের সেই অন্ধকার, নির্জন রাস্তা এমনিতে ভীতু ছেলেটিকে অসম্ভব সাহসী ক'রে তুলেছিল সেদিন। আজ বুঝতে পারে জীবনে সেই প্রথম অসহায় শরীরময় অন্ধ আক্রোশ নিয়ে সময় ও গতির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু করেছিল সে—একদমে দেড় মাইল রাস্তা ছুটে এসে অনুভব করেছিল একরকম সাফল্য—তীব্র আহ্লাদে ঘেমে উঠেছিল শরীর। তখন জানত না, আরো এক প্রতিপক্ষ আড়ালে পিছনে টেনে রেখেছিল তাকে, স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিল সময় ও গতি। জানত না, শরীর-মনের প্রবণতা ছাড়িয়ে আছে আরো এক শক্তি, যার প্রবল আবির্ভাবে আকণ্ঠ অসহায়তা ছাড়া আর কিছু বোধ করা যায় না।

'ব্রাহ্ম মুহূর্তে মৃত্যু মানুষের পুণ্যের পরিচয়!' বাবার নাড়ি দেখে বলেছিল হরেন ডাক্তার, 'এসে কোনো লাভ হলো না!'

ব্রাহ্ম মুহূর্ত ; কথাটা গেঁথে গিয়েছিল বুকে। আকাশে তাকিয়ে সেদিনও সপ্তর্ষি পেয়েছিল দীপ্ত ; হঠাৎ পাখির গলায় ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল কান। ক্রমশ ফুটে উঠেছিল আলো। আজ বহুদিন পরে আবার সেই প্রত্যূষের দিকে তাকিয়ে জলে ভ'রে উঠল চোখ।

'বাবা!'

কুড়ি কি একুশ বছরের ব্যবধান পেরুতে সময় লাগল না। এখনো গতি তার প্রধান উৎস। তফাৎ এইটুকু ; আজ, এই মুহূর্তে, একটু বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে।

সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রগড়াচ্ছে পাপু। সকালে ঘুম ভাঙার পর সচরাচর মা'র পাশে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেয় সে, তখনো অন্ধকার থাকে। দরজা খোলা দেখে আজ চ'লে এসেছে ব্যালকনিতে।

হঠাৎ আবেগে দু' হাতে ছেলেকে ওপরে তুলে নিল দীপ্ত।

বয়স হওয়ার পরও মা'র মুখ থেকে 'খোকা' ডাক যায় নি।

পাপু বলল, 'তুমি কাঁদছ!'

'যাঃ, বোকা!' কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল দীপ্ত, পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছে স্বচ্ছভাবে হাসল। ছিঃ, দীপ্ত, মনে মনে বলল, বিহেভ ইওরসেল্ফ্! লোকে তোমাকে 'হার্টলেস্' ব'লে জানে—শরীর, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি আর লক্ষ্যের একাগ্রতায় হৃদয় ব'লে কিছুর প্রয়োজন তুমি বোধ করো নি কখনো! এক রাতের দুঃস্বপ্ন আর স্মৃতির ঘায়ে এতোখানি বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যু স্বাভাবিক; মৃত্যুরও আড়ালে দাঁত নখ শানিয়ে নিচ্ছে অনেকে। শরীরে মৃত্যু বহন ক'রে এখনো কেউ কেউ অতিবাহিত করছে নিজেকে, শেষ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছে কেউ—একবার ধ্বনিত হলেই ছুটে যাবে ক্রিমেটোরিয়ামের দিকে!

পর পর মুখগুলি ভেসে উঠল চোখের ওপর। আবার ফিরে আসছে স্বাভাবিক মানসিকতা—নিয়মে চঞ্চল হয়ে উঠছে পেশী-গুলো।

কোলে তোলা এবং কোল থেকে নামানো দুটোই এতো তাড়াতাড়ি ঘটল যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পাপু। অবাক চোখে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি কাঁদছিলে! আমি দেখেছি—'

'দ্যাট্স্ ব্যাড, পাপু!' ছেলের মাথার চুলগুলো আদরে মুঠোয় চেপে ধরল দীপ্ত, 'কাম-অন! আচ্ছা, বলো তো, তুমি আমার কে?'

'কে আবার! ছেলে—'

'আর আমি তোমার কে?'

'কে আবার! বাবা—'

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটি ছেলেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে দেখল দীপ্ত—অসহায় তার শরীরে ফুঁসে উঠেছে অন্ধ আক্রোশ। হেসে বলল, 'তুমি কি জানো, আমারও একজন বাবা ছিল?'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল পাপু। জয়িতাও এসে পড়েছে।

'কী চ্যাঁচামেচি করছ বলো তো দু'জনে! ঘুমটা ভাঙিয়ে

দিলে !'

'নাথিং···।' চুলের গোছা মুখের প্রায় আধখানা আড়াল ক'রে রেখেছে, একটু বা এলোমেলো পোষাক, হাত দুটো পকেটে। এটা ব্যালকনি না হয়ে লন হ'লে ভালো হতো। দামী মডেল ; এমন চেহারায় যে-কোন হেডলাইন জুতসই হতে পারে। জয়িতাকে লক্ষ করতে করতে দীপ্ত বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভালো ঘুমিয়েছো। আমি ঘুমোতে পারিনি।'

'কেন !'

'একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল—'

কথাটা বাড়াল না দীপ্ত। ব্যালকনিতে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে পাপু, কান এদিকে। এখুনি হয়তো পুরনো কথা টানবে ; জয়িতা জানবে। খানিক আগেকার অনুভূতি এখনো নরম হয়ে আছে চোখে। হার্টলেস—সম্ভবত জয়িতাও বিশ্বাস করে কথাটায়। এক-এক সময় বলেও ফেলে। অর্থে তারতম্য থাকলেও বিষয়ের ভার কমে না। দুর্বলতার কথা জানিয়ে এখন আর নিজেকে চিনিয়ে লাভ নেই। এই বিষাদ তার নিজস্ব ; নিজেরই থাক।

'স্ট্রেঞ্জ !' দীপ্তর ভারী মুখের দিকে তাকিয়ে জয়িতা বলল, 'অন্যদিন কি ভালো স্বপ্ন ছাখো !' তারপর পাপুর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। কথাটায় গুরুত্ব দিল না তেমন। কখনো, কোনো ব্যাপারেই যে কাতর হয় না, আজ হঠাৎ তার কথায় গুরুত্ব না দেওয়াই স্বাভাবিক।

লন পেরিয়ে কাগজের হকারকে ঢুকতে দেখল দীপ্ত। জীবন শুরু হচ্ছে আর-একটি দিনের মতো, প্রায় একই ছকে। একটি মোটর ছুটে গেল দ্রুত, প্র্যামে বাচ্চা নিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে আয়া, দূর থেকে ভেসে এলো মোটর-বাইকের আওয়াজ। দু' এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা যাবে সেই বিশালবপু লোকটিকে—কব্জিতে চামড়ার ব্যাণ্ড, চোখে সানগ্লাস—শীভার্সের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। মিসেস রবিনসনকে টানতে টানতে এগিয়ে

চলেছে চেন-বাঁধা বুলডগ। ওপরের ফ্ল্যাটে রেডিওগ্রাম চালু হলো : 'ইট ওয়াজ অ্যানাদার স্টোরি'। এরপরেও কী কী ঘটবে, কমবেশী কাছাকাছি ব'লে দিতে পারে দীপ্ত। নির্জনতা জায়গা বদল করছে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। বাকী সবই সরব। আগের পাড়াতেও দেখে এসেছে এ-সব, হয়তো পরেও দেখবে। মানুষ বদলায় না, বদলে যায় তার পোষাক আর ঘরবাড়ি, দরজার পর্দা আর ঘরের আসবাব। তবু প্রাণহীন বস্তুর পরিবর্তনেও কতো ভিন্ন দেখায় মানুষকে!

পাপু স্কুলে যাবে। এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে তোড়-জোড়। চেঁচিয়ে আয়াকে ডাকল জয়িতা—'তুম কোই কাম্‌কা নেহি হ্যায়'। রোজই সে একই কথা বলে, ধমকায় একই গলায়। পাপুর পড়া তৈরি হয় নি, দোষারোপ করে সে-জন্যেও। কাল অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনেই বাড়ির বাইরে ছিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পার্টিতে। পাপুর কী দোষ! দীপ্ত ভাবল, কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় জয়িতাকে। কী ভেবে নিরস্ত করল নিজেকে। কী লাভ! অসম্ভব খাপছাড়া লাগছে আজ, মনে হচ্ছে এই প্রাত্যহিকতার সঙ্গে বস্তুত কোনো যোগ নেই তার! যোগ নেই তার সঙ্গে জয়িতার কিংবা জয়িতার সঙ্গে পাপুর। রক্তের যদি প্রকৃতই কোনো আকর্ষণের ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে এতোটা অসহায় লাগত না নিজেকে।

স্বপ্নটা ফিরে আসছিল। নদীর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'টি কিশোর—পরনে কোরা ধুতি, গলায় সুতোয় বাঁধা চাবি। আগে আগে পুরুত ঠাকুর। হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ···কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল; দীপ্ত দেখল, সাদা থান-পরা রক্তাপ্লুত একটা শরীর লুটোচ্ছে মাটিতে···চীৎকার করছে জয়িতা আর পাপু···! সম্ভবত তখনই ঘুম ভেঙে যায় তার!

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে চা আর খবরের কাগজ দু'টিতেই মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল দীপ্ত। সিগারেট ধরাল। জুত হলো না তবু। নিক্সন থেকে ইন্দিরা গান্ধী, বিদ্যুৎ সংকট থেকে বাঘের উপদ্রব,

সিনেমার রিভিউ থেকে বিজ্ঞাপনের হেডলাইন—প্রতি সূত্রে শব্দ গুলো বেজে যাচ্ছে খংখং ক'রে, তাৎপর্যহীন ও নির্বিশেষ—শব্দ-গুলিতে তারতম্য নেই কোনো। মুখার্জীর চেম্বারে ব'সে একদিন পাইলিংয়ের শব্দ শুনেছিল সে, আজও শুনল। কোথায় যেন খুঁজে পাচ্ছে একটা ধ্বনিগত ঐক্য। শব্দটা আকস্মিক, কিন্তু অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে নিঃশ্বাস আর অনুভবের সঙ্গে। ন্যাগিং! হঠাৎই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয় মনে।

ভালো লাগছে না। উঠে এসে বেডরুমে ঢুকল দীপ্ত। রাইটিং টেবিলের ওপর জড়ো করা আছে কিছু কাগজপত্র। কিছু খুঁজল সেখানে আঁতিপাতি ক'রে, বুক সেল্‌ফের ড্রয়ার খুলে দেখল, তারপর বিছানায়, বালিশের নীচে। নেই! অসহায়তা ছিলই, এখন শরীর জুড়ে তাপ ছড়াচ্ছে রাগ। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মাথার পিছনের ঝাঁকড়া চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরল দীপ্ত।

'জয়িতা!'

সাড়া পেল না কোনো। একটু অপেক্ষা ক'রে আবার গলা চড়াল দীপ্ত, 'জয়িতা—'

'কী হলো! হোয়াই আর ইউ শাউটিং!' দূর থেকে জবাব দিল জয়িতা।

'সেই চিঠিটা কোথায়?'

দীপ্ত এখনো খুঁজছে। কিছুটা এলোপাথাড়িভাবে।

'কোন চিঠি?' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল জয়িতা।

'ইউ ফরগেট এভ্‌রিথীং! কাল একটা চিঠি এসেছিল—কাকার কাছ থেকে, মা'র শরীর খারাপের কথা লিখেছিল···'

'সেটাই বলো!'

অল্প ভুরু তুলল জয়িতা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিল হাতে; পোস্টকার্ডটা বের ক'রে বাড়িয়ে দিল দীপ্তর দিকে।

বাংলা পড়া আজকাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে দীপ্ত। বিশেষত চিঠিপত্রের বাংলায় সে আগ্রহ বোধ করে না খুব, চোখ বুলিয়েই

শেষ হয় দায়িত্ব। প্রয়োজনে জয়িতাই জবাব দেয়। 'খোকা আজকাল একেবারেই চিঠি দেয় না—', অনেকদিন আগে মা'র এই চিঠি পড়ে চুপচাপ হেসেছিল সে। এ-সব জয়িতার কাজ —মাসে মাসে টাকা পাঠানোর কথাই যা মনে থাকে শুধু। আজকের চিঠিটা মা'র নয়—কাকার; কাল অফিস থেকে ফিরে পেয়েছিল। পার্টিতে বেরুনোর তাড়ায় কোনোরকমে চোখ বুলিয়েই ফেলে রেখেছিল। আবার খুঁজে পাবে ভাবে নি।

জয়িতা চ'লে গেছে। একা-একা চিঠিটা পড়ল দীপ্ত, আদ্যন্ত —একবার, দু' বার, স্নায়বিক উত্তেজনায় ঠোঁট কেঁপে উঠল অল্প। ক্লান্ত লাগছে। স্বাস্থ্যের মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে একটা কিছু। রাতে ঘুম হয় নি ভালো, সে-জন্যেও হতে পারে। বিষণ্ণ মনে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে।

অফিসে বেরুবার আগে জয়িতাকে বলল, 'মা'র শরীর ভালো যাচ্ছে না। কিছুদিন এনে রাখলে হয় না!'

'আনলেই পারো।' জয়িতা বলল, 'আমি মানা করিনি!'

'জানি।'

তখনই আর কোনো কথা খুঁজে পেল না দীপ্ত। জয়িতা ঠিকই বলেছে। সে মানা করেনি, দীপ্ত নিজেও কি করেছে! তাহ'লে এতো দূরত্ব কেন!
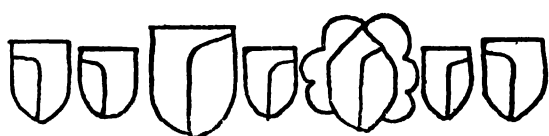
খবরটা আনল সমীরণ। কাল রাত ন'টার পরে সুনীতাকে দেখা গেছে সিন্‌হার সঙ্গে—প্রিন্সস্‌ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এই মেলামেশায় দু'জনেরই প্রশ্রয় ছিল।

শুনে বিরক্ত হলো দীপ্ত।

'আমি কী করতে পারি! ইট্‌স্‌ আপ টু দেম!'

সমীরণ বলল, 'সুনীতাকে ডেকে কড়কে দাও। একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না!'

'ঠিক আছে। আমি কথা বলব।'

সমীরণকে আজকাল বিশেষ সহ্য করতে পারে না। যতো দিন যাচ্ছে, দেখছে সমস্যার সমাধানে কোনো কাজে না-আসুক, নতুন সমস্যার সৃষ্টিতে জুড়ি নেই ওর! মাঝে মাঝে মনে হয় সমীরণের চাকরিটা বিজ্ঞাপনের নয়, পুলিসের! এই প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দে চোখ রাখার দায়িত্ব কে তুলে দিল ওর হাতে! এমনও হতে পারে, মানুষকে সন্দেহ করতে করতে কিছুটা বাতিক-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে; পার্থক্য করতে পারে না প্রয়োজন অপ্রয়োজনের মধ্যে। সুনীতাকে দেখা গেছে সিন্‌হার সঙ্গে—এটা কি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়! বিশেষত দীপ্তর কি আছে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার! হিন্দুস্থান ফস্টারের একজন কর্মী সুনীতা—সে-হিসেবে তার প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব আছে দীপ্তর; কিন্তু, যে-সুনীতা সুনাতারই ব্যক্তিগত, তার প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করবে সে! সেটা কি অনধিকার চর্চা নয়!

তবু, বিষয়টা থেকে গেল মাথায়। এমনকি, এক সময় ভাবল দীপ্ত, সমীরণ হয়তো অন্য কোনো ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল। সিন্‌হার ইচ্ছেয় কিছুটা বাধ্য হয়েই ক-ফি-একাউন্টের ভার দেওয়া হয়েছে সুনীতাকে। উদ্দেশ্যটা প্রাঞ্জল—সম্ভবত এখনো কিছু

বুঝতে পারেনি সুনীতা। মেয়েটি অ্যাম্‌বিসাস, স্বাস্থ্য ও রূপের ঘাটতি নেই শরীরে, কাজকর্মে পটু হলেও বুদ্ধি প্রখর নয় তেমন। এমন কি হতে পারে, সিন্‌হাকে খুশী করার চেষ্টায় ক্রমশ আত্মক্ষতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সুনীতা? যদি তাই হয়, দীপ্তর কি করার আছে কিছু?

দীপ্ত ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বাজে প্রায়। সুজন এসেছে—কাল ফোন করেছিল শম্পাদি। দীপ্ত বলেছিল, আজই যাবে দেখা করতে; কলেজ-ফেরৎ আসতে বলেছে শম্পাকে। সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা নাগাদ তার এসে পড়ার কথা। দেরী দেখে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারছে না কেন, ঘড়ির কাঁটা যতো এগোচ্ছে, ততোই মনের মধ্যে ছায়া বিস্তার করছে শূন্যতা। অথচ শম্পাদির আসা বা সুজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া—নিয়ম রক্ষা ছাড়া এগুলো আর কী! এগুলো বাদ পড়লে কি জীবন তার কাছে কম সহনীয় হতো! নাকি এরও মধ্যে কাজ করছে সেই অদৃশ্য পিছুটান, এতোদূর এগিয়ে এসেও যা তাকে বিহ্বল ক'রে তোলে মাঝে মাঝে!

বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা, দুটোই এখন সমান সক্রিয়। আর-কিছু করার না পেয়ে সুনীতাকে ডেকে পাঠাল দীপ্ত। সত্যি বলতে, এতোক্ষণে আর-একটা কথাও ভাবতে শুরু করেছিল সে। বাড়িতে কাজ আছে ব'লে কাল একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছিল সুনীতা। কাজটা কি সিন্‌হাকে সঙ্গদান! যদি তাই হয়, তাহ'লে ধ'রে নিতে হবে ইতিমধ্যেই আড়ালে লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে সুনীতা। এটাও এক ধরনের প্রতারণা।

সুনীতা এলো পাংশু মুখে। সেদিন রাতের ঘটনার পর থেকেই লক্ষ করছে দীপ্ত, সুনীতা তার সামনে আগের মতো স্বাভাবিক হতে পারে না। ভয়ে? নাকি দীপ্তর অসম্পূর্ণ খেলায় আঘাত লেগেছিল তার আত্মাভিমানে! দীপ্তর অবশ্য তাতে যায় আসে না বিশেষ। তেমন প্রয়োজন হ'লে সে আবার হাত বাড়াতে পারে, ইচ্ছে মতো, এক রাতেই টের পেয়ে গেছে সুনীতার

প্রতিরোধ! এখনকার চিন্তা সেইজন্যেই আরো বেশী।

'কাজকর্মের প্রোগ্রেস কী?' কিছু বুঝতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল দীপ্ত।

সুনীতা দাঁড়িয়েছে টেবিলের কোণ ছুঁয়ে। প্রশ্নটায় আশ্বস্ত হলো।

'নো প্রব্লেম, এক্সেপ্ট্—'

'এক্সেপ্ট্ হোয়াট?'

'স্টুডিয়োতে দেরী হচ্ছে একটু...'

'আই সী!' দীপ্ত ভাবল একটু। 'ও. কে। আমি কথা বলব। কাল সকালে ডিটেল্স রিপোর্ট দিও আমাকে।'

সুনীতা ঘাড় নাড়ল। চ'লে যাওয়ার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা প্রকাশ পেল।

দীপ্ত বলল, 'আমি তোমাকে চ'লে যেতে বলিনি।'

অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সুনীতা।

'কাল রাত্রে সিন্হাব সঙ্গে দেখলাম তোমাকে। প্রিন্সেস্ থেকে বেরুচ্ছিলে—।' আড়ে তাকিয়ে বলল দীপ্ত, 'ডীনারে ডেকেছিল?'

সুনীতা ইতস্তত করবে জানা কথা। অস্বস্তির ভিতর গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল নিজেকে।

'মিস্টার সিন্হা ইনভাইট করেছিলেন। আই মীন...কয়েকটা পয়েন্ট ডিসকাস করার ছিল...'

'সামথিং অফিসিয়াল!' হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দীপ্ত। 'আমার মনে হয়, একাউন্টের প্রাইমারী রেসপনসিবিলিটি আমার। কিন্তু আমিই জানি না ব্যাপারটা! আর্নট্ ইউ টেকিং লিবার্টি!'

টেলিফোনের শব্দ। রিসিভার তুলতেই অপারেটর বলল, একজন মহিলা দেখা করতে চান। শম্পাদি ছাড়া আর কে হতে পারে! দীপ্ত বলল পাঠিয়ে দিতে।

সুনীতা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নীচু ক'রে। কানেব আভা বদলে

যাচ্ছে ক্রমশ। শম্পা ঘরে ঢুকল। সংক্ষেপে 'এসো' ব'লে সুনীতার দিকে তাকাল দীপ্ত।

'হেন্‌স্‌ফোর্‌থ্‌ কথাটা মনে রাখলে ভালো হয়। ইউ মাস্ট স্পীক্‌ টু মী ফার্স্ট।'

'আই অ্যাম সরি, মিস্টার রে!'

'আই ট্র্যা।'

কথাটা শেষ করতে চাইল দীপ্ত। শম্পাদি অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

সুনীতা চ'লে যাওয়ার পর বলল, 'সাড়ে চারটেয় সময় দিয়ে এলে পাঁচটার পর! ব্যাপার কী!'

'কী করব বল! ট্রামে বাসে আসা, যা ভীড়!' আঁচল টেনে কপাল মুছল শম্পা, 'মেয়েদের ওপরেও বসিং করিস নাকি?'

'বসিং!'

'তাই তো দেখলাম। আহা, আমার সামনে না বললেই পারতিস!'

দীপ্ত একটা গন্ধ পেল। ক্লান্তির। ঘামেরও হতে পারে। শম্পাদি ব'সে আছে টেবিলে কনুই মেলে. বেয়াড়া রাস্তা, হয়তো সত্যিই ক্লান্ত। গন্ধটা তাকে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। হেসে বলল, 'তোমার সামনে বলিনি, তুমিই ইনট্রুড্‌ করেছ।'

'তাই কি! তাহ'লে ওয়েট করতে বললেই পারতিস!'

'ও কথা থাক।' দীপ্ত সহজ হলো। 'কী খাবে বলো? কফি?'

'কিছু খেতে হবে কেন! বরং বেরিয়ে পড়ি, সুজনকে বলেছি বিকেলেই আসব। রতন চ'লে যাচ্ছে, আজ ওকে খেতে বলেছি রাত্রে।'

রতন! হঠাৎ ভুরু সিরসির ক'রে উঠল দীপ্তর। যাবে? নাকি ব'লে দেবে, আজ থাক, আজ কাজ আছে একটু—কাল নিজেই চ'লে যাব! সেটা উচিত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এতোদূর টেনে এনেছে শম্পাদিকে। এখন

ফেরানো অভদ্রতা।

একটা সিগারেট ধরাতেই হলো। 'সামলে নিয়ে বলল, 'তাড়ার কী আছে! যাবে তো গাড়িতে।'

'খাওয়া তাহ'লে··'

বেয়ারাকে তাড়াতাড়ি কফি আনতে বলল দীপ্ত। প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ধোঁয়া টেনে নিল বুকে। কাল ফোন পাওয়ার পর থেকেই টের পাচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রীর কোথাও যেন চিড খেয়ে গেছে একটু। এখন সেখানে সেঁক দিয়ে যেতে হবে।

শম্পার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে চেম্বারের দেয়ালে দেয়ালে, খুঁটিনাটি সর্বত্র। চোখমুখের মুগ্ধতা এড়াতে পারছে না। ঘাম এখানে ঢুকতে পাবে না কখনো, তবু অভ্যাসেই আঁচল বুলিয়ে নিল মুখে।

'তোকে দেখে ঈর্ষা হয়, দীপ্ত। ইচ্ছে হয় থেকে যাই। সত্যিই আরামে আছিস!'

দীপ্ত বলতে যাচ্ছিল 'থাকো না!' কৌশলে পেরিয়ে গেল পুরো বাক্যটি। হাসল শব্দ ক'রে।

'তুমি আরামটাই দেখছো! বাট অ্যাট হোয়াট প্রাইস!'

'প্রাইস আবার কী! সব তো কোম্পানীই দিচ্ছে!'

'দিচ্ছে। সেটাই মনে হবে···'

ঈষৎ অন্যমনস্ক হলো দীপ্ত। ঝকঝকে রোদ্দুরে গা শুকোচ্ছে তীব্র নীল। পর পর ক'দিন বৃষ্টি হয় নি। হয়তো হবে না আর। আশ্বিন খসে ক্রমশ ন্যাড়া হবে রোদ্দুর, উত্তুরে হাওয়ায় শীত জানান দেবে শরীরে। যেন আগেভাগেই সেই হাওয়া ছুঁয়ে গেল তাকে। কাঁধ দুটো জায়গা মতো ফিরিয়ে আনতে আনতে দীপ্ত দেখল, দূরে বারোতলা নতুন বাড়ির গায়ে বাঁশের ভারায় দাঁড়িয়ে প্লাস্টার লাগাচ্ছে দু'টি লোক। মাটি অনেক নীচুতে। হঠাৎ পড়ে গেলে মাটিতেই পড়বে—অতোদূর উচ্চতা আর মাটির মধ্যে আত্মরক্ষার ভূমি নেই কোনো। আর, পতন মানেই তো মৃত্যু!

কফি দিয়ে গেছে। শম্পা একটা কাপ টেনে নিল। দীপ্তর

মনে হলো বোধহয় একটু বেশী সময়ই সে নীরব থেকেছে। কিছু বলার তাড়ায় ব্যস্ত হাত বাড়াল কফির দিকে। তারপর বলল, 'নূতন চাকরি পেয়েছে এটা ভালো খবর। তবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে পারত!'

'কেন!'

'এখানেই নেবো ভেবেছিলাম ওকে। হয়তো সময় লাগত একটু।'

'ব্যাঙ্কের চাকরি খারাপ কি! তাছাড়া—', শম্পা বলল, 'সুজন বলছিল, তোদের অফিসের চাকরি ওকে স্যুট্ করত না।'

'কেন!'

শম্পা চুপ ক'রে থাকল।

দীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'সুজন জুটিয়ে দিল?'

'ঠিক সুজন নয়। মেদিনীপুরে ব্র্যাঞ্চ খুলছে নতুন—সুজন ওদের একজন ডিরেক্টরকে চেনে, তিনিই ক'রে দিলেন। রেজাল্ট তো খারাপ ছিল না!'

'চাকরিটা কেরানীর, সারা জীবন কেরানীই হয়ে থাকবে। এখানে স্টেটাস পেত!' হ্যাঙার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিল দীপ্ত, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে প্রায়। চলো, যাই।'

শম্পা বলল, 'তুই কি বলছিস, ভালো করল না?'

'আমি কিছুই বলিনি।' যেতে-যেতে টাইয়ের নট্ ঠিক ক'রে নিল দীপ্ত, 'এ ডিসিসন ওয়ান্স্ টেকেন ইজ টেকেন। হয়তো ভালোই হবে।'

'তোর যে ওকে এখানে নেবার ইচ্ছে সেটা তো কখনো জোর দিয়ে বলিস নি!'

ঘাড় বেঁকিয়ে শম্পাকে দেখল দীপ্ত। হাসল। বহু দিনের অভ্যাস-করা হাসি। এর জন্যে অনেকবার তাকে দাঁড়াতে হয়েছে আয়নার সামনে, তীব্র চোখে চিনতে হয়েছে অদৃশ্য স্তাবকের মুগ্ধতা। হাসির সঙ্গে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা মেশালে যে-কোনো মেয়েই গর্ভবতী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাঁপবে। 'কীভাবে তাকাও তুমি!'

জয়িতা বলেছিল একদিন, সে অনেকদিন আগেকার কথা। জয়িতাকে বলেনি, এই লুক্ আয়ত্ত করতে কম মহড়া দিতে হয়নি তাকে! এটা সিক্রেট। এলিভেটরের একান্তে সুনীতাও কি বিব্রত বোধ করেনি!

কিন্তু, শম্পাদি দৃষ্টিপাতের অপেক্ষা করল না, হাসিরও না। চমৎকারভাবে নরম হয়ে এলো প্রতারণার কাছে। সেদিন বাড়িতে এটা পারেনি দীপ্ত—অন্যমনস্কতা টেনে রেখেছিল সত্যের দিকে। আজ পারল। শম্পাদি বিশ্বাস করেছে রতন সম্পর্কে আগ্রহ ছিল তার এবং রতন অপেক্ষা না-করায় অখুশিই হয়েছে সে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এ-সব দেখাশোনায় এতোটুকু টাল খায়নি শম্পাদির ধারণায়। অথচ, কতো সহজে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল দীপ্ত!

পৃথিবী কি প্রতারণার ওপরেই চলছে! আজ সে প্রতারণা করল শম্পাদির সঙ্গে, একটু আগে ধরা পড়ে গেছে সুনীতাও। খুঁজলে আরো দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। একজন দু'জন হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত—অপ্থাল্মিক ডিজঅর্ডারে একের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে আর-এক, একই মুখের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে আর-এক মুখ! কিসের আকাঙ্ক্ষায় বোঝা যায় না। মুখার্জীর মৃত্যু কামনায় সিন্হার অপেক্ষা—বুঝতে পারে সে; বুঝতে পারে সিন্হার জন্যে পুষি দত্তের আহ্লাদ। সুনীতাকেও বুঝতে পারে কিছুটা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী অস্পষ্ট লাগে নিজেকে। একদিন খুব কাছে ছিল শম্পাদি, কালেভদ্রে দেখা হওয়া বা কথা বলা ছাড়া পার্থিব আর কোনো সম্পর্ক নেই এখন—তবু সুযোগ নিল সে। কেন? শুধুই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে? নাকি আর-একটা ভয়ও তার ছিল: যে-মহানুভবতায় কোনোদিনই ফিরে যেতে পারবে না, অন্তত শম্পাদির চোখে নিজের সেই ভূমিকা ছুঁইয়ে রাখল একটু!

অনেকক্ষণের মধ্যে একটিও কথা বলেনি দু'জনে। ঘড়ি দেখল, না, অনেকক্ষণ বলা যাবে না। আসলে নীরবতার জন্যেই সময়কে মনে হচ্ছিল দু' গুণ, তিন গুণ। এরই মধ্যে শম্পাদিব শারীরিক

উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে হতে একটু হাল্‌কা হতে চাইল দীপ্ত। চেষ্টা, ক'রে সেই গন্ধটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল আবার —ঘামের বা ক্লান্তির; শম্পাদি প্রসাধনে বিশ্বাস করে না, এ তার শরীরের গন্ধ। প্রতিটি নারীর মধ্যে একই অবয়বের ছক, শম্পাদিকে ভাবতে গিয়ে জয়িতার শরীর ভেবে নিল দীপ্ত —তবু প্রত্যেককে এতো আলাদা মনে হয় কেন! বিশ-পঁচিশ মিনিট ঠাণ্ডা ঘরে থেকে মাজা বাসনের মতো ঝকঝক করছে শম্পাদির মুখ; মাথা ও ঘাড়ের মধ্যে, ঘাড় ও বুকের মধ্যে, মাংসের এমন সুসম ঢল চোখে পড়ে না সহজে। চোখের কোলে, চুলের সিঁথিতে সময় ছাপ রাখলেও খুব সহজেই শরীরে বয়স লুকিয়ে রাখতে পেরেছে শম্পাদি। বদলায়নি তেমন। শম্পাদি বলতে পারে—একদিন জিজ্ঞেস করবে সে কতোটা বদলেছে।

'সুজন আছে কেমন? খুব বদলে গেছে?' এইভাবে শুরু করল দীপ্ত।

'বদলাবে কেন! মাথায় টাক পড়েছে অল্প, না হ'লে সেই-রকমই আছে!'

'সেইরকমই!' একটু হাসল দীপ্ত, 'তাহ'লে লক্ষ করো নি। নিশ্চয়ই বদলেছে। সকলেই বদলায়—'

'তোর মতন?'

'বলতে পারো।' মানিয়ে নেওয়ার ধরনে বলল দীপ্ত, 'কিন্তু, আমি কি খুবই বদলে গেছি, শম্পাদি?'

'খু-উ-ব।' এলানো গলা শম্পার। ভেবে বলল, 'সেটা আর অস্বাভাবিক কি! সকলেই বদলায়।'

একই কথা, সে নিজেই বলেছিল খানিক আগে, শম্পাদি প্রতিধ্বনি ক'রে গেল। সম্ভবত খুব গভীরভাবে ভেবে ছাখেনি —প্রতিধ্বনির মধ্যে লুকিয়ে রাখল নিজেকে। এতোক্ষণে একটা কথা মনে হচ্ছিল দীপ্তর: সম্পর্কে ছেদ পড়ে গেছে অনেকদিন আগেই, এই যাওয়াটা রতনের সূত্রে, তার বা শম্পাদির বা সুজনের পারস্পরিক টানে নয়। রতনের চাকরির জন্যে একদিন বাড়িতে

এসেছিল শম্পাদি, হঠাৎ, তখনই সুজনের কথা ওঠে—রতনের চাকরিটা হয়ে না গেলে শম্পাদি হয়তো যেচে ফোন করত না আর। ফোনটা কী জন্যে করেছিল? সুজন এসেছে জানাতে? নাকি রতন চাকরি পেয়েছে, দীপুর সাহায্য ছাড়াই পেয়েছে—এটা জানিয়ে তার অহঙ্কারে ঘা দিতে চেয়েছিল! আসল উদ্দেশ্যটা মিটে যাওয়ার পর আসছে আজকের প্রয়োজন। এই যাওয়াটা ভদ্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। না গেলে অখুশী হতো না শম্পাদি!

খুব দ্রুত নীচে নেমে এলো দীপু। সম্পর্কের ভিতরে আছে জটিলতা—জটিলতার ভিতরে ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে সম্পর্কগুলি। পাশাপাশি, সহজ রাস্তা ভেবে এতোক্ষণ এগিয়ে যাচ্ছিল সে, এখন মনে হচ্ছে, ঐ রাস্তায় পৌঁছুনো যাবে না। ধস্ নেমে যাচ্ছে মধ্যিখানে। অথচ, অতীত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট—মাঝখানের ঐ ধস্টুকু না থাকলে অসুবিধে হতো না কোনো। শম্পাদি কী ভাবছে অনুমান করা মুশকিল; কিন্তু, দীপু জানে, মাঝখানের দূরত্ব শুধুই এক হাতের নয়; এখন হাত বাড়ালেই সুনীতার মতো টেনে নিতে পারবে না শম্পাদিকে।

বিকেলের রাস্তা। ভিড় বেশী। শম্পাদি রাস্তা দেখছে। রাস-বিহারীর মোড় পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে এগোতে এগোতে দীপু জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক যাচ্ছি তো?'

'ঠিক। এখন সোজা যেতে হবে—'

'সোজা! এককালে অবশ্য তাই মনে হতো।'

'মানে?'

'কতোবার গেছি! আজ তবু জিজ্ঞেস করতে হলো তোমাকে!'

'হয় রে, হয়। আগ্রহ কমে গেলে এমনি হয়। শেষ কবে গিয়েছিলি মনে পড়ে?'

'কবে?'

উত্তরটা আগে ভেবে রাখেনি শম্পাদি। ভেবে নিতে যতোক্ষণ সময় লাগে তার চেয়ে বেশী নিল।

'মা মারা যাবার পর—'

'না। তোমার মেমারি খারাপ—'

'কেন!'

'বলছি। সুজন যেদিন চ'লে গেল। ঠিক বলেছি? আমি ওকে পৌঁছে দিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে, তুমিও ছিলে!'

'ঠিক।'

চোখ তুলে তাকাল শম্পা। কিছু একটা বলতে চাইল, বলল না। দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিল না।

অল্প অস্বস্তি বোধ করল দীপ্ত। তাকানোর ধরনটা নতুন নয়। একটু আগে স্মৃতির প্রসঙ্গ তুলেছিল সে, এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে শম্পাদি—দৃষ্টি দিয়ে যা বোঝাল, শব্দ তার চেয়ে বেশী দূর যেতে পারে না। সময়ও পারে না। দৃষ্টি নয়, যেন কানের পাশে একটা দেশলাই জ্বেলে ধরল শম্পাদি—শরীরময় ছড়িয়ে পড়ছে উত্তাপ: মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে?

অনুভূতির মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে প্রথম শরীর; আশ্চর্য, এতোদিন পরেও দীপ্ত সেই অনুভব ধরে রাখতে পেরেছে পুরোপুরি! অস্বস্তি বেশী লাগায় টাইয়ের নটটা খোলার জন্যে ব্যস্ত হাত বাড়াল সে, আর তখন—ঠিক তখন—হাত বাড়িয়ে ওর কব্জিটা চেপে ধরল শম্পা।

'খুলছিস কেন!'

'গরম!' প্রায় ছেলেমানুষের গলায় বলল দীপ্ত, 'তাছাড়া—সুজনের কাছে যাচ্ছি, এখন আর এটার দরকার নেই!'

'এ-ছাড়া ন্যাড়া লাগবে তোকে। সুজন দেখুক, না হয় পরে খুলে ফেলিস।'

অ্যালকাহলের তীব্র ঝাঁঝে র হয়ে আছে শরীর, স্টীয়ারিংটা ঠিক ক'রে ধ'রে টাইয়ে লিপ্ত হাতটা শম্পার হাতের ওপর রাখল দীপ্ত। আঙুলের ডগায় যদি কোনো তাপ থাকে, শম্পাদি টের পাবে। পাক। এখন সে অনেক বেশী সাহসী।

হাতটা নিজেই টেনে নিল শম্পা। সামনে বাক; ভয়ঙ্কর শব্দে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাম। নির্ভুল সাহসে

পাশ কাটিয়ে গেল দীপ্ত।

'এখুনি অ্যাক্সিডেন্ট হতো!'

'হতো না…।' দীপ্ত হাসল। বেঁকিয়ে বলল, 'এখন আর ওসব ভয় নেই। তুমি আমাকে কতোটুকু চেনো!'

'তুই একটুও বদলাসনি, দীপ্ত।'

ব্যবধানটা এখন আগের মতোই। শম্পা বলেছিল ব'লে নয়, এমনিতেই গলার আল্‌গা হওয়া ফাঁসটা শক্ত ক'রে নিল দীপ্ত। বিড়ালের থাবা ঘষার ভঙ্গিতে হাতটা বুলিয়ে নিল মুখের ওপর। রোদ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ছায়াকে, ফুটপাথ দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে পিলপিল ক'রে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ। তাদের মুখে ছায়া। দু' পাশের আটসাঁট বাড়ির ছায়া ঢুকে পড়েছে গাড়ির মধ্যেও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা হবে সুজনের সঙ্গে, বেশ কয়েক বছর পরে। সেজন্যে এখন থেকেই তৈরি হওয়া দরকার।

একটা সিগারেটের অভাব বোধ করছিল দীপ্ত। গীয়ার চেঞ্জ ক'রে ফাঁকা রাস্তা খুঁজল। জলেভেজা একটা নিটোল বাদামী হাত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে অ্যাব্‌স্ট্রাকসনের ভিতর। ইচ্ছে করলেই দীপ্ত আর তাকে ছুঁতে পারে না। হয়তো পারত একদিন। তাহ'লে জীবন অন্যরকম হতো।

কথাটা ভেবে ডুবে যাওয়া যায়। স্মৃতি নাড়া দেয় না কোনো—একা-একা অনুভূত বলেই কেমন কোণঠাসা লাগে নিজেকে।

সুজন আর অলিপ্ত গেল কোণারক বেড়াতে। দীপ্তর জ্বর; দু'দিন এক নাগাড়ে সমুদ্র-স্নানের জের টানছিল একা। শম্পাদি গেল না। গল্পে গল্পে, আলস্যে, পার হলো সকালটা। দুপুরে অসহ্য রোদে তেতে উঠল বালিয়াড়ি। জ্বর এলো। ওরই মধ্যে শুনতে পেয়েছিল সেই কিছু-বা সলজ্জ গলা: 'তোয়ালেটা ভুলে এসেছি, একটু এনে দিবি?' বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত তাপ আনাগোনা করছিল সর্বাঙ্গে, সেই একই তাপ

কেন্দ্রীভূত হলো বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে। দরজার ফাঁকে এগিয়ে এসেছে একটা জলেভেজা বাদামী হাত! স্বাস্থ্য তখন প্রবল, নিম্নগামী তাপ স্তব্ধভাবে অপেক্ষা করছিল বিস্ফোরণের। দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়নি কথাগুলো। কিংবা, কনুই থেকে নিঃশব্দে ঝ'রে-পড়া জলের বিন্দুগুলিতেই ছিল তার উচ্চারণ! সাহস হয়নি। সেদিন, প্রায় তিন চার মিনিট পরে, তোয়ালেটা এগিয়ে দিতে গিয়েও স্পর্শ এড়িয়ে গিয়েছিল সে – দেখেছিল তোয়ালে-ধরা একটি মুঠি কীভাবে নিস্তেজ হয়ে আসে ক্রমশ। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দরজাটা। দীপ্ত ভেবেছিল, সুযোগ একবারই আসে।

শম্পাদিও কি তাই ভেবেছিল? হয়তো। হয়তো নয়। ভাবনা-গুলো ধরা পড়েছিল শম্পাদির পরবর্তী আচরণে—দূর থেকে দেখায়, এড়িয়ে যাওয়ায়। হয়তো সেই একবারই একটু অন্যরকম হতে চেয়েছিল শম্পাদি, স্নেহ ও বন্ধুতার থেকে আলাদা ক'রে দেখিয়ে-ছিল নিজেকে। নিঃশব্দ আহ্বানে যে সাড়া দিতে পারে না, অন্য কোনো আহ্বানও তার কাছে মূল্যহীন। 'তুই একটুও বদলাসনি, দীপ্ত!' কী বলতে চেয়েছিল শম্পাদি—হাতের ওপর হাত রাখার চেষ্টায় কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নেই! সেদিন যা পারেনি, আজ তা পারার সুযোগ নেই কোনো!

হয়তো ঠিকই। তখন সাহস মানে সাহসই বোঝাতো—নারী মানে অস্পষ্টতা; কাঁচা মাংসে চকচক করত আলো। এখন সে স্বাদ বুঝে গেছে!

'ব্যস, এবার বাঁ দিকে—'

স্পীড্ বেশী ছিল। ব্রেক কষে ব্যাক করতে হলো। বাঁয়ে ঘোরার সুযোগে একবার শম্পাকে দেখে নিল দীপ্ত। শরীরে যে বয়স লুকিয়ে রাখতে পারে, জ্বর তার কাছে কোনো বিষয় নয়। এটা তার অনেকবারই মনে হয়েছে। পুরনো হতে হতে মরচে ধ'রে যাচ্ছে স্মৃতিতে, এখন তাকালেই চোখ যায় চওড়া সিঁথিতে, বিষণ্ণ চোখের কোলে। তবু, সেদিনের অস্পষ্টতা এখনো

তাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে মাঝে মাঝে।

জ্ঞানে শম্পাদি এখন স্বাভাবিক হবে। থামতে না থামতেই নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি।

'শেষ পর্যন্ত এলি তাহ'লে?'

'এলাম। কিন্তু, বসব না বেশীক্ষণ। তোমাকে বলিনি, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।'

শম্পা তাকাল। কিছু বলবে ভেবে ঠোঁট ফাঁক করল অল্প, বলল না। শেষ বিকেলে প্রথম রঙ বদলায় ঘাস, মাটি, রাস্তা; এগুতে থাকে ছায়া। দীপ্ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে ছায়াগুলো, আধাআধিভাবে তারা ছুঁয়ে আছে তাকে আর শম্পাকে। যুক্তি বা গায়ের জোর দিয়ে সরানো যাবে না তাদের—সন্ধ্যার ছায়া ঊর্দ্ধগামী। আশেপাশে তাকিয়ে সে বলল, 'অনেক বদলে গেছে দেখছি।'

দরজা খুলল রতন।

'আ-রে, দীপ্তদা! আসুন, আসুন—'

'কী খবর!'

শম্পাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে অল্প ইতস্তত করল দীপ্ত, তারপর বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকল।

একেবারে মনে না-পড়ার মতো কিছু নয়। দরজার পর তিন হাত এগোতে না এগোতেই সিঁড়ি ঘুরে গেছে ওপরে। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েই দীপ্ত মনে করতে পারল, সিঁড়ির শেষে দরজা পাবে, এক ফালি লম্বা বারান্দার শেষে রান্নাঘর, বাথরুম। বাঁ দিকে পর পর দু'টি ঘরের মাঝখানে দরজা আছে। মাসীমা থাকতে দু'টিই শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার হতো। মাসীমা যাওয়ার পরও তাই ছিল, আগের মতোই বসার ঘরের তক্তপোষে রাত কাটাতো সুজন, একার জন্যে আলাদা ঘর পেয়েছিল শম্পাদি। অবশ্য বেশীদিনের জন্যে নয়। যে-সিঁড়ি দিয়ে একদিন মাসীমার ছোটোখাটো শরীরটাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নীচে, সেই সিঁড়ি দিয়েই একদিন সুজনের স্যুটকেস হাতে নেমে গিয়েছিল